আধুনিক শিল্পশিক্ষা

আধুনিক শিল্পশিক্ষা

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

প্রকাশ ভাদ্র ১৩৭৯ : ১৮৯৪ শক

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু -কৃত নকশাকারী নমুনা এবং তৎকৃত কয়েকটি আলপনার ইউনিটের অনুকৃত চিত্র সংবলিত

প্রচ্ছদচিত্র শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় -কৃত নকশা থেকে গৃহীত
নামাক্ষরলিপি শ্রীসুবিমল লাহিড়ী -কৃত

প্রকাশক রণজিৎ রায়
বিশ্বভারতী। ১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট। কলিকাতা ১৬

মুদ্রক শ্রীপীযূষকান্তি দাশগুপ্ত
শান্তিনিকেতন প্রেস। শান্তিনিকেতন। বীরভূম

১·১

নিবেদন

শিল্পশিক্ষা সংক্রান্ত কোনো প্রামাণিক গ্রন্থ বাংলা বা অন্য কোনো আধুনিক ভারতীয় ভাষায় আজও রচিত হয় নি। কাজেই শিল্পী ও শিল্প-অনুসন্ধিৎসু হিসাবে নিজের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ফলশ্রুতিই হল এই রচনা। গ্রন্থটি প্রধানত আধুনিক ভারতে শিল্পশিক্ষার একটি ঐতিহাসিক আলোচনা। এই ইতিহাস তিনটি পর্যায়ে চিহ্নিত— ১. ইংরাজ-প্রবর্তিত আর্টস্কুলের শিক্ষা ২. ভারতীয় পদ্ধতিতে শিল্পশিক্ষা এবং ৩. আধুনিকতম শিল্পশিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য।

মূল শিক্ষানীতির বিবর্তন অনুসরণ করাই আলোচনার প্রধান লক্ষ্য। সেজন্য বিভিন্ন প্রদেশের শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে কোনো আলোচনা করা হয় নি। আরো একটি কারণ হল এই যে, উল্লিখিত তিনটি শিক্ষাদর্শের বাইরে নূতনতম কোনো শিক্ষা-নীতি প্রবর্তনের চেষ্টা আমাদের লক্ষ্যগোচর হয় নি। দেশের মাটিতে শিল্পশিক্ষার মৌলিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিকল্পনা অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের অবদান। এই কারণে এই দুই আচার্যের শিক্ষা-সম্বন্ধে কিছু বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

যে ইতিহাস নিয়ে এই বইখানিতে আমি আলোচনা করেছি সেই ইতিহাসের সঙ্গে আমার কর্মজীবন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। আমি শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র ছিলাম এবং শিল্পচর্চা করেছি নন্দলালের ছাত্ররূপে। দীর্ঘকাল কলাভবনের শিক্ষকরূপেও কাজ করেছি। অতি ঘনিষ্ঠভাবে শান্তিনিকেতন ও কলাভবনে যুক্ত থাকার কারণে এই ইতিহাস সন্নিবদ্ধ করতে যেমন সুবিধা হয়েছে তেমনি অসুবিধাও বোধ করেছি পদে পদে। তাই অনেক বিষয়ে অনেক কথাই স্পষ্ট করে বলা সম্ভব হয় নি।

নন্দলালের যে-সব ছাত্ররা তাঁর সহকারীরূপে কাজ করেছিলেন তাঁদের প্রভাব সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ করা হয়েছে। ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকরা এই-সব অংশকে, আশা করি, বিস্তৃততর পটভূমিতে স্থান দিতে পারবেন।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে পুস্তক-পুস্তিকার সাহায্য নিয়ে এই শিক্ষা-ইতিহাস রচিত হয় নি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই পাদপীঠের কাজ করেছে। সতীর্থ বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাও অনেকগুলি তথ্য পরিবেশনে সাহায্য

করেছে। কলাভবনের ইতিহাস তেমনি সব আলোচনার মাধ্যমে লিপিবদ্ধ হয়েছে। সন-তারিখের ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়তো ভবিষ্যতে সংশোধন করার প্রয়োজন হবে। তবে বিবর্তনের ধারা নির্ভুলভাবেই আলোচিত হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। শিক্ষাকেন্দ্রের ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ করতে হলে পরিচালন, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এবং প্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুনগুলিরও উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই বিষয়গুলির আলোচনা অবশ্য এই ইতিহাসে সন্নিবদ্ধ করা হয় নি। প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাপদ্ধতি ও পরীক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধেই আমি সমধিক আলোচনা করেছি। প্রসঙ্গত আরো একটি কথা বলা দরকার যে, যে সমস্ত আর্টস্কুলের এখানে উল্লেখ আছে সেগুলি তো বটেই, মাদ্রাজ ছাড়া ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত শিল্প-শিক্ষাকেন্দ্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অধ্যাপকদের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই সে-সমস্ত প্রতিষ্ঠানের তথ্য সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

শিক্ষিত সাধারণের কাছে এই পুস্তকের আবেদন কতখানি পৌঁছবে জানি না। তবে আশা করি শিল্প-শিক্ষক শিল্পী ও শিল্প-অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি এই পুস্তক থেকে কিছু নূতন তথ্য আহরণ করতে পারবেন। এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট আচার্যদের উক্তিগুলির কোনো প্রমাণ উল্লেখ করা না হলেও এই উক্তিগুলিকে পাঠক নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করতে পারেন।

এই গ্রন্থ রচনাকালে এবং তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে আমি কয়েকজনের অকুণ্ঠ সহায়তা ও সহযোগিতা পেয়েছি। পৃথকভাবে তাঁদের সকলকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা সম্ভব না হলেও তাঁদের সকলের নিঃস্বার্থ সহায়তার জন্য আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। তবে বিশেষভাবে অধ্যাপক শ্রীকাঞ্চন চক্রবর্তীর নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করছি। অধ্যাপক শ্রীসুখময় মিত্র, অধ্যাপক শ্রীসোমেন্দ্র রায় ও পাণ্ডুলিপির অনুলেখনে সাহায্য করেছেন শ্রীমতী শিবানী রায় ও শ্রীমতী শীলা সিংহরায়। এঁদের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

পরিশেষে বলতে চাই যে বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য ও কলাভবনের অধ্যক্ষ শ্রীদিনকর কৌশিক এই গ্রন্থ রচনার ব্যাপারে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁদের এই সময়োচিত সাহায্য না পেলে এই পুস্তক প্রকাশ হয়তো সম্ভব হত না।

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

বিষয়সূচী

শিক্ষা ও শিল্প

শিক্ষার লক্ষ্য মানুষের পূর্ণ বিকাশ। মানবীয় চেতনার বিচিত্রমুখী গতিপ্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ শিক্ষার লক্ষ্য হলেও এই লক্ষ্যে প্রায়ই মানুষ পৌঁছতে পারে না। কারণ বাধা পদে পদে উপস্থিত হয়। এই বাধা অতিক্রম করার চেষ্টা থেকেই শিক্ষাপ্রণালীর উদ্ভব। অর্থাৎ মনুষ্যত্বের বিকাশের পথে যে-সব বাধা উপস্থিত হয় সেগুলিকে কী করে অতিক্রম করা যেতে পারে তারই নির্দিষ্ট পন্থার অপর নাম শিক্ষাপদ্ধতি। কিন্তু কোনো শিক্ষাপদ্ধতি চিরস্থায়ী নয়। লক্ষ্য এক হলেও রীতিপদ্ধতির পরিবর্তন বারংবার ঘটেছে। এই কারণে বলা যেতে পারে শিক্ষাপদ্ধতি পরিবর্তনশীল। অধিকাংশ সময়ই এই বিবর্তনের মূলে থাকে সমাজের প্রভাব। এই কারণে শিক্ষাপদ্ধতির বিবর্তন অনুসরণ করতে হলে বা নূতন পদ্ধতি প্রবর্তন করার কালে সমাজের অবস্থা-ব্যবস্থার দিকে লক্ষ দিতে হয়।

যদিও সমাজ মানুষেরই সৃষ্টি তৎসত্ত্বেও সমাজ বারংবার মনুষ্যত্বের বিকাশের পথে প্রচণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ সমাজ সকল সময়ই অভ্যাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ কথা স্বীকার করতে আমরা বাধ্য, অভ্যাস ছাড়া কোনো শিক্ষার বুনিয়াদ গড়ে ওঠে না। অপর দিকে এ কথাও ঠিক যে, অভ্যাসকে অতিক্রম করতে না পারলে বৈচিত্র্যময় মানবজীবনের পূর্ণ বিকাশ কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। অভ্যাসের দ্বারা অর্জিত শিক্ষার দ্বারাই অভ্যাসকে ভাঙতে হয়। পুরানোকে ভেঙে নূতনের প্রবর্তন ব্যক্তিগত মানুষের ক্ষেত্রেই প্রথম অঙ্কুরিত হয়। ক্রমে তার প্রভাব প্রতিফলিত হয় সমাজ-জীবনে। ভাঙাগড়ার মুহূর্তে দ্বন্দ্ব আত্মপ্রকাশ করে এবং লড়াই লাগে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে।

মানবীয় জীবনের অন্যতম প্রকাশরূপেই সমাজের উপযোগিতা। তবে কেন সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিগত মানুষের দ্বন্দ্ব সম্পূর্ণভাবে আজও তিরোহিত হল না সে বিষয়ে প্রশ্ন স্বভাবতই জাগবার কথা।

এই প্রশ্নের জবাব অনেক জ্ঞানীগুণী দিয়েছেন। আলোচনার সংগতি

রক্ষার জন্য আমাদের এ বিষয়ে দু-এক কথা বলা দরকার। অভ্যাসের পথেই সঙ্ঘবদ্ধ জীবন তথা সমাজের সূচনা। অভ্যাসের দ্বারা যে শক্তি অর্জন করা হয় তার ফলে মানুষের মধ্যে একটা নিরাপত্তার ভাব আসে। জীবনধারণের সুশৃঙ্খল বিধিব্যবস্থা ও নিরাপত্তা যতই কাম্য হোক-না কেন অনেক সময় অভ্যাসের পরিণামরূপে যে সংস্কার গড়ে ওঠে সেটিকে ভাঙার প্রয়োজন হয়। ভাঙবার মুহূর্তে নূতন অভ্যাস নূতন শিক্ষা প্রবর্তন অপরিহার্য। কাজেই মানবীয় বিকাশের পথে সঙ্ঘবদ্ধ জীবন একাধারে সম্পদ ও অপর দিকে বিপদ-বাধা উপস্থিত করে।

সূক্ষ্ম বা গভীর মানবীয় চেতনার অন্যতম প্রকাশ শিল্পকলা। এই চেতনা সম্বন্ধে যে-কোনো ভাবেই হোক মানুষ সচেতন থেকেছে। তাই শিল্পের প্রভাব-বর্জিত সমাজ কোথাও দেখা যায় না। জীবনধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত বা সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রকাশ সম্বন্ধে চেতনা কখনো নিষ্প্রভ কখনো উজ্জ্বল কিন্তু সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয় নি।

জীবনধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত শিল্পরূপের সঙ্গে সমাজের অবস্থা-ব্যবস্থার সম্বন্ধ কতটা ঘনিষ্ঠ সূক্ষ্ম বা গভীর অনুভূতিগ্রাহ্য শিল্পের সঙ্গে সামাজিক বিধিবিধানের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষভাবে অনুসরণ করা সকল সময় সম্ভব হয় না।

শিল্পের প্রধান তাৎপর্য অভিব্যক্তির দিক দিয়ে। হৃদয়হীন মানুষ শক্তিশালী হলেও যেমন তার বর্বরতা ঘোচে না তেমনি শিল্পাশ্রিত অভিব্যক্তির অবর্তমানে সমাজে বিশেষ রকমের বর্বরতার লক্ষণ দেখা দিতে বাধ্য।

এক সময় শিল্পকলার সৃষ্টির ক্ষমতাকে ঐশী শক্তির অন্যতম প্রকাশ বলে ধরা হত। ক্রমে শিল্পসৃষ্টি ব্যক্তিগত প্রতিভার অবদানরূপেই গৃহীত হয়। বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রসার যতই বেড়েছে ততই শিল্পসৃষ্টির সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি অপেক্ষা নানা তথ্য জটিল হয়ে দেখা দিয়েছে। এই মুহূর্তে যে শিল্পরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করছি তার লক্ষ্য প্রধানত উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।

শিল্পের উদ্দেশ্য আদর্শ যেমন পরিবর্তিত হয়েছে তেমনি শিল্পের শিক্ষা সংক্রান্ত বিধিব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে

ভারতবর্ষের জীবনে যে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটেছে তারই অন্যতম প্রকাশ আধুনিক শিল্প ও শিল্পশিক্ষা -পদ্ধতি।

ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে যে সমাজ ভারতের বৃহত্তর জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল সেই সমাজকে শিল্প সম্বন্ধে সজাগ করার জন্যই এ দেশে নূতন প্রতিষ্ঠিত শহরগুলিতে শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ক্রমে জাতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে চেতনা উদ্ভূত হওয়ার সঙ্গে শিল্পশিক্ষার আর-একটি অধ্যায় শুরু হল। এই দুই ভিন্নমুখী শিক্ষানীতির প্রভাবে আজকের দিনে ভারতীয় শিল্প ও শিল্পশিক্ষার গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়ে চলেছে।

শিল্পশিক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে আজকের দিনের মত আর ঊনবিংশ শতাব্দীর মনোভাবের মধ্যে পার্থক্য অনেক।

শিল্প যে শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ এবং শৈশবকাল থেকেই এ বিষয় দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন এ কথা ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্পশিক্ষকদের লক্ষ্যের বাইরে ছিল বলেই শিল্পশিক্ষা অনেক দিন পর্যন্ত অপরিণত থেকেছে। শিল্পশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা আমাদের থাকা দরকার। দুর্ভাগ্যক্রমে শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা তথাকথিত শিক্ষিত মহলেও দুর্লভ। সচরাচর তথ্যসংগ্রহের সুযোগ-সুবিধা মুক্ত করাকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা শিক্ষার চূড়ান্ত আদর্শ বলে মনে করি। এরই অপর নাম বৈজ্ঞানিক শিক্ষা। এই জাতীয় শিক্ষার দ্বারা মানুষের সকল রকমের বিকাশ হওয়া সম্ভব নয় বলেই বিজ্ঞান-প্রভাবান্বিত ইউরোপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করেছে যে অনুভূতিগ্রাহ্য বিষয়গুলিও শিক্ষার ক্ষেত্রে অপরিহার্য। এই কারণেই শিল্প ও কলা আজ শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ বলে স্বীকৃত হয়েছে।

শিল্পকলাকে শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গরূপে গ্রহণ করার পরিকল্পনা এ দেশে শুরু হয়েছিল প্রথম-মহাযুদ্ধের পর। এক শত বৎসরের তথ্যমূলক শিক্ষার প্রভাবে শিক্ষিত ভারতবাসীর মন ও চিন্তা তথ্যের বাধায় সে সময় ভারাক্রান্ত। এই কারণে নূতন পরিকল্পনা শিক্ষাব্রতীরা সেই সময় অনায়াসে গ্রহণ করতে পারেন নি। ইংরাজ-প্রতিষ্ঠিত শিল্পবিদ্যালয়ের সময় থেকে এই মুহূর্ত পর্যন্ত

শিল্পশিক্ষার আদর্শ ও শিক্ষাদানের রীতিপদ্ধতি অনুসরণ করাই এই আলোচনার লক্ষ্য। ইংরাজ-পরবর্তী ভারতের শিল্পশিক্ষা এই আলোচনার বিষয় হলেও পাশ্চাত্য প্রভাব-বহির্ভূত ভারতীয় শিল্পশিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করা দরকার। কারণ ভারতীয় শিল্পের জাগরণ ও শিল্পশিক্ষার পরবর্তী বিধিব্যবস্থার ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় শিল্পশিক্ষার অভিজ্ঞতাকে আয়ত্ত করার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। মধ্যযুগে শিল্পশিক্ষার লক্ষ্য ছিল কারিগর তৈরি করা। তথাকথিত fine art ও applied art উভয়ের মধ্যে একটি সংযোগ স্থাপন শিল্পশিক্ষার আদর্শ ছিল। এই কারণে অভিজ্ঞ শিল্পীর অধীনে সহযোগিতা করে শিল্পশিক্ষা শুরু হত। ইংরাজ-প্রবর্তিত শিল্পশিক্ষার প্রভাবে কারিগরি-সুলভ মনোভাব থেকে তৎকালীন শিল্পশিক্ষার্থীরা সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিলেন। সে সময় কারুকলা সম্বন্ধে কঠিন অবজ্ঞা শিল্পরসিকদের মধ্যে জেগেছিল। কিন্তু কারিগরি শিক্ষার পথ অনুসরণ না করে যে নিস্তার নেই এ কথা আধুনিক কালে অনেকেই অনুভব করেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শিল্পশিক্ষা বহু পরিমাণে সমাজবিমুখ। এই সমাজ-বিমুখতা থেকেই শিল্পীদের সমাজ-সচেতন করে তোলার চেষ্টা থেকেই আধুনিক ভারতে শিল্পশিক্ষার নূতন অধ্যায় দেখা দিয়েছে। এই নূতন অধ্যায়ের অনুসরণ করার পূর্বে ইংরাজ-প্রতিষ্ঠিত শিল্পবিদ্যালয়ের কর্মপ্রণালী ও আদর্শ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করে নেওয়া দরকার।

মিশনারি ও ভারতীয় পণ্ডিতদের সহযোগিতায় উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইংরাজি শিক্ষার যে ব্যবস্থা শুরু হয়েছিল সে ক্ষেত্রে শিল্পশিক্ষার কোনো স্থান ছিল না। মিশনারিদের শিক্ষাব্যবস্থার বহু পূর্বে থেকে এ দেশে ইউরোপীয় শিল্পী, কিউরিয়ো ডিলারের যাতায়াত শুরু হয়েছিল। এই-সব পর্যটক-শিল্পীদের প্রভাবে দেশীয় সমাজে পাশ্চাত্য শিল্পবস্তুর প্রচলন হয়েছিল। ক্রমে এই-সব শিল্পবস্তুর সংস্পর্শে এসে সম্ভ্রান্ত সমাজে রুচির পরিবর্তন ঘটে।

উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে কলকাতা শহরে স্টুডিয়ো করে অনেক আর্টিস্ট যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করেছিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দৌলতে

সে সময় যাঁরা প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন, প্রধানত তাঁরাই ছিলেন এই-সব শিল্পীর পৃষ্ঠপোষক।

এই-সব শিল্পীর সংস্পর্শে বাস্তবতার যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তারই পরবর্তী প্রকাশ পাশ্চাত্য-রীতিতে শিল্পবিদ্যালয়-স্থাপন। এই সময় নূতন ধরনের কারিগরেরও প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। ছাপাখানার সঙ্গে যুক্ত নানা রকমের ছবি নক্‌শা ম্যাপ ইত্যাদি লিথো প্রেসে ছাপার ব্যবস্থা কলকাতা শহরেই প্রথম হয়েছিল। এই-সব ছাপাখানায় দেশীয় কারিগররা হয়তো সহকারীরূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তবে দেশীয় ভাষায় বই ছাপার জন্য যখন অক্ষর তৈরির আয়োজন হয়েছিল সেই সময় থেকে সত্যকারের পাশ্চাত্য-রীতিতে শিল্পশিক্ষা শুরু হয়। এই প্রসঙ্গে উইলকিন্স সাহেব ও তাঁর অধীনে শিক্ষিত কৃষ্ণচন্দ্র মিস্ত্রীর নাম উল্লেখ করতে হয়। কৃষ্ণচন্দ্র মিস্ত্রী সম্ভবত স্বর্ণকার ছিলেন। উইলকিন্স সাহেবের কাছ থেকে তিনি অক্ষর কাটার কাজ শেখেন ও অল্পকালের মধ্যে নিপুণ কারিগররূপে পরিচিত হন। কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ থেকেই তাঁর পুত্র ও জামাতা কাজ শেখেন এবং শ্রীরামপুরে চিত্রিত পঞ্জিকা ইত্যাদি ছাপাতে শুরু করেন। বলা যেতে পারে, ছাপাখানাকে কেন্দ্র করেই বিদেশী শিক্ষা দেশীয় কারিগর-সমাজে প্রচলিত হয়েছিল। অর্থনৈতিক অবস্থার সুরাহা করবার জন্য ইংরেজ কর্তৃপক্ষ কারিগরি শেখবার জন্য একটি সমিতি গঠন করেন।

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের জন্যই এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভার অবদান, এবং শিল্পবিদ্যালয় নাম দিয়ে যে প্রতিষ্ঠান শুরু হয় তা থেকে কলকাতা শহরে শিল্পশিক্ষার পত্তন হল বলা চলে।

তৎকালীন বিখ্যাত ধনী হীরালাল শীলের বাড়িতে এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্কুলে হিন্দু মুসলমান অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সকল রকমের ছাত্রই প্রথম নেওয়া হয়। কিন্তু হঠাৎ ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি না পেয়ে ক্রমে ক্রমে হ্রাস পেয়েছিল।

সে সময়ে শিল্পবিদ্যালয়ে কী কী বিষয় শিক্ষা দেওয়া হত তার একটা তালিকা দেওয়া গেল :

1. Elementary Drawing ; drawing from models and natural object and architectural drawing.

2. Etching, Engraving on wood, metals and stone.

3. Modelling, including pottery.

সিলেবাস দেখলেই বোঝা যাবে উচ্চাঙ্গের শিল্প শেখাবার জন্যে শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নি। শিক্ষার বিষয় ও রীতি প্রবর্তনের কালে ভারতীয় অবস্থা-ব্যবস্থার কথা স্মরণ না রেখে তৎকালীন ইংলণ্ডের টেক্‌নিক্যাল স্কুলের অনুকরণের চেষ্টা শুরু হল এই দেশে। দেশীয় কারিগরীর উন্নতি অপেক্ষা নূতন জাতের কারিগর তৈরি করাই এই শিক্ষার লক্ষ্য ছিল। শিল্পবিদ্যালয়ের তৎকালীন অবস্থা-ব্যবস্থা নিম্নের উদ্ধৃতি থেকে পাওয়া যাবে—

"১৮৫৫ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে স্কুলের সংশ্লিষ্ট একটি সংগীত-বিদ্যালয় খুলিবার কথা হইয়াছিল কিন্তু এ প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ পরিত্যক্ত হয়। সেই বৎসরের আরম্ভে ইংলণ্ড হইতে একজন কাঠের খোদাই শিখাইবার নিমিত্ত শিক্ষক আনা হয়। ঐ বৎসরই স্থির হয় যে স্কুলের তিনটি বিভাগ হইবে—

1. Modelling and Moulding Department.
2. Engraving and Lithographic Department.
3. Department of Higher Drawing and Painting.

এতদ্ব্যতীত Photographic painting শিখাইবার বন্দোবস্ত হয়। ইট গড়ানো শিখাইবার কথা উঠে— স্থির হয় যে স্কুলে এ বিষয় শিক্ষা না দিয়া পাথুরেঘাটায় (where pottery clay is abundant) ইহার নিমিত্ত একটি স্বতন্ত্র স্কুল খোলা হইবে। এরূপ স্কুল কখনো গঠিত হয় নাই। উপরে যে তিনটি বিভাগের কথা বলিলাম, নিয়ম হইল যে ছাত্রেরা শিখিবার নিমিত্ত প্রতি বিভাগে আড়াই টাকা করিয়া মাসিক বেতন দিবে। তবে তাহাদিগের কর্তৃক নির্মিত সামগ্রী বিক্রয় করিয়া যাহা লাভ হইবে তাহার এক অংশ তাহারা পাইবে।

যখন স্কুলগুলি খুলিবার প্রস্তাব হয় তখন স্থির হইয়াছিল যে সাধারণ

হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া স্কুলের ব্যয় নির্বাহ হইবে। প্রথম দুই বৎসর মাসে মাসে প্রায় ২০০৲ টাকা চাঁদা উঠিত। তদ্‌ব্যতীত, এককালীন দান হইতেও কিছু টাকা জমে। দুই বৎসরের পর চাঁদার টাকা অনেক কমিয়া যায়। পরে গভর্নমেন্টের সাহায্য স্কুল-প্রতিপালনের প্রধান অবলম্বন হয়। বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপনের সময় গভর্নমেন্ট হইতে Grant-in-aid হিসাবে মাসিক ৬০০৲ টাকা দেওয়া হইত।

প্রথম বৎসর যখন স্কুলটি খোলা হয় তখন ২৬৩ জন ছাত্র ভর্তি হয়। কিন্তু অল্পসময়ের মধ্যেই তাহাদের অধিকাংশ ছাড়িয়া দেয়। বৎসরের শেষে ৫৩ জন মাত্র ছাত্র ছিল। গড়ে ৬০ জন করিয়া ছাত্র পড়িত। ১৮৫৪ সালের আগস্ট মাসে স্কুলটি স্থাপিত হয়। ১৮৫৮ সালের এপ্রিল মাসের শেষ পর্যন্ত সর্বশুদ্ধ ৫০৪ জন ছাত্র ভর্তি হয়।

ইউরোপীয়	২
ফিরিঙ্গি	১৩৭
বাঙালী হিন্দু	৩৫৬
বাঙালী মুসলমান	৭
হিন্দুস্থানী	২
মোট	৫০৪

ইংলণ্ড হইতে ২৫০৲ টাকা বেতনে ড্রইং ও উডএনগ্রেভিং শিখাইবার নিমিত্ত একজন শিক্ষক আনা হয়। ১৮৫৮ সালের জুলাই মাসে Moulding ও Modelling শিখাইবার নিমিত্ত আর একজন ইউরোপীয় শিক্ষক M. Regand নিযুক্ত হয়। সেই সময় হইতেই স্কুলের অবস্থা হীন হইয়া আসে। ১৮৫৮ সালে পরিদর্শক Lt. Williams স্কুল পরিদর্শন করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন—

> I am disposed to recommend Government to undertake the entire management of the school connecting it perhaps in some way with the C. E. College and looking to it to

ultimately become a normal school for native drawing masters."[১]

উপরের উদ্ধৃতি থেকে শিল্পবিদ্যালয়ের তৎকালীন অনিশ্চিত অবস্থা সম্বন্ধে আমরা ধারণা করে নিতে পারি। এই অনিশ্চিত অবস্থা থেকে শিল্পবিদ্যালয়কে উচ্চাঙ্গের আর্টস্কুলে পরিণত করার জন্য অধ্যক্ষ H. N. Locke-এর কৃতিত্ব স্মরণীয়।

অধ্যক্ষ লক আর্টস্কুলে যোগদান করেন ১৮৬৪ সালে। এই সময় থেকে পেন্টিং মডেলিং বিভাগের উন্নতি শুরু হয়। অপর দিকে শিল্পবিদ্যালয়ে যে বিষয়গুলি শেখার ব্যবস্থা ছিল সেগুলি অক্ষুণ্ণ থাকে। অর্থাৎ লক স্কুলের শিক্ষা দুটি অংশে ভাগ করলেন। এক দিকে fine art অন্য দিকে applied art। গ্রীক রোমান রেনেসাঁ যুগের মূর্তির যথাযথ ছাঁচ (applied cast) ও পাশ্চাত্য আদর্শে মূর্তি-চিত্র ইত্যাদি (শেখবার) উপকরণের সাহায্যে শিক্ষা দেবার যে ব্যবস্থা অধ্যক্ষ লক করেছিলেন তার থেকে বড়ো রকমের কোনো পরিবর্তন ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ঘটে নি। অর্থাৎ ইউরোপীয় পদ্ধতিতে শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন অধ্যক্ষ লক। Oil Painting, Water Colour drawing, Cast drawing, Life study প্রতিকৃতি অঙ্কন—এগুলি ছিল চিত্রকলা বিভাগের ছাত্রদের শিক্ষার বিষয়।

Modelling বিভাগের ছাত্রদের ছাঁচ নেওয়া বিশেষভাবে শেখাবার ব্যবস্থা ছিল। Free-hand drawing, মেকানিক্যাল drawing আলংকারিক নক্শার নকল এগুলি আবশ্যিক ছিল।

Mr. Schaumburg, Ghilardi ও Jobbins এই তিনজনের প্রভাবে আর্টস্কুলের অল্পবিস্তর পরিবর্তন ঘটলেও লকের পরিকল্পনা কোনোদিনই কেউই বর্জন করেন নি। প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার যে আর্টস্কুলে কোনো অধ্যক্ষই দীর্ঘকাল অধ্যক্ষতার কাজ করতে পারেন নি। এই কারণে পরিচালনা এবং

১ শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হিন্দুজাতি ও শিক্ষা, দ্বিতীয় ভাগ।

শিক্ষানীতির বারে বারে ব্যাঘাত ঘটেছিল। এই অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার ক্ষেত্রে Ghilardi ও Jobbinsএর প্রভাব বিশেষভাবে স্মরণীয়।

পোর্ট্রেট painting, still life ও oil paintingএর করণ-কৌশল অধ্যক্ষ Jobbinsএর আমলে যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করেছিল। যে কোনো কারণে হোক Modelling বিভাগে অনুরূপ উন্নতি সে সময় হয় নি।

যে সময়ের ইতিহাস আমরা আলোচনা করছি সে সময় আর্টস্কুল সরকারি ও বে-সরকারি নানা চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছিল বলেই আর্টস্কুলের উপযোগিতা সম্বন্ধে সরকারি মহলে কোনোরকম সন্দেহ ছিল না। মিউজিয়াম, বোটানিক্যাল গার্ডেন, এশিয়াটিক সোসাইটি, মেডিক্যাল কলেজ ইত্যাদি নানা সরকারি প্রতিষ্ঠানের নক্‌শা চার্ট plaster cast ইত্যাদি আর্টস্কুলের শিক্ষক ও ছাত্ররা সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই চাহিদার কারণে এন্‌গ্রেভিং ও লিথোগ্রাফ বিভাগ সকল সময়ই সক্রিয় ছিল।

আর্টস্কুলের শিক্ষার বিষয় ও বিধিব্যবস্থার আলোচনার সঙ্গে শিক্ষক ও শিক্ষাপদ্ধতির যোগ খুবই ঘনিষ্ঠ। এই কারণে তৎকালীন শিক্ষার প্রণালী উল্লেখ করা দরকার। তৎকালীন আর্টস্কুলের শিক্ষার বিধিব্যবস্থা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তা থেকে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে, সে শিক্ষা শিল্পসৃষ্টির অনুকূল ছিল না। বস্তুরূপে অনুকরণের দক্ষতা অর্জন করানোর দিকেই কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য ছিল। এই লক্ষ্যে পৌছবার জন্যই যতপ্রকারের ব্যবস্থা হতে পারে তার দিকে অধ্যক্ষ এবং ইংরেজ শিক্ষকরা লক্ষ রেখেছিলেন। এই কারণে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কোনো অভাবনীয় সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় নি সে-সময়কার শিক্ষকদের। অভ্যাসের পথে কতকগুলি করণ-কৌশল আয়ত্ত করাই ছিল ছাত্রদের লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যে পৌছে দেবার সহায়ক ছিলেন শিক্ষকরা। সংক্ষেপে মধ্যযুগীয় কারিগরদের মতো কতকগুলি নির্দিষ্ট করণ-কৌশল প্রথা-নুগতভাবে শিক্ষক থেকে ছাত্রদের মধ্যে প্রবর্তিত হত। প্রায় সকল বিভাগেই ইংরেজ শিক্ষক কোনো-না-কোনো সময় ছিলেন। ক্রমে স্কুলের শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পীরা শিক্ষকতার কার্যে নিযুক্ত হন। এ দিক দিয়ে অন্নদাচরণ বাগচির নাম

বিশেষভাবে স্মরণ করতে হয়। অন্নদাচরণ প্রথম যুগে শিল্পবিদ্যালয়ে এনগ্রেভিং-এর কাজ শিখেছিলেন। পরে অধ্যক্ষ লকের কাছে তিনি বিশেষভাবে ছবি আঁকা শেখেন। এবং কিছুকালের মধ্যে শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ক্রমে আর্টস্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ পান। অন্নদাচরণ এবং তাঁর অধীনে শিক্ষা-প্রাপ্ত ছাত্ররাই স্কুলের নানা বিভাগে শিক্ষকের কাজ করেছিলেন। যে ভাবে ইংরেজ অধ্যাপকদের কাছ থেকে তাঁরা শিক্ষা পেয়েছিলেন সেই শিক্ষাপ্রণালী যথাসম্ভব তাঁরা অনুসরণ করেছিলেন। ছাত্রদের উৎসাহ বাড়িয়ে তোলার অসাধারণ ক্ষমতা অন্নদাচরণের ছিল। অন্নদাচরণের প্রভাব লক্ষ্য করতে হলে স্কুলের বাইরে তৎকালীন আর্টস্কুলের শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণ শিল্পীদের কর্মপ্রণালী অনুসরণ করা প্রয়োজন।

শিল্পবিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব থেকে কলকাতা শহরে এনগ্রেভিং-এর স্টুডিয়ো লিথোপ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। ক্রমে আর্টস্কুলের শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পীরা কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীনভাবে স্টুডিয়ো প্রতিষ্ঠা করেন। এই-সব স্টুডিয়োতে কিছু কিছু শিক্ষার্থী হাতে-কলমে এন্‌গ্রেভিং-এর কাজ শিখতেন। এইভাবে এন্‌গ্রেভিং-এর একটি পরম্পরা কলকাতা শহরে গড়ে ওঠে। হাফটোন ব্লক চালু হবার পূর্ব পর্যন্ত এ-সব কারিগররা বাজারের সকল রকমের ব্লক প্রস্তুত করতেন। এবং জনপ্রিয় ছবিও কিছু কিছু প্রকাশিত হয় এই-সব কারিগরদের সাহায্যে। ক্রমে আর্টস্কুলের Fine Arts বিভাগের একদল ছাত্র অন্নদাচরণের নেতৃত্বে আর্টস্টুডিয়ো প্রতিষ্ঠা করেন।

অন্নদাচরণ বাগচি ও তাঁর ছাত্র-সহকর্মীদের চেষ্টায় এই আর্টস্টুডিয়ো দীর্ঘকাল কলকাতাবাসীর নানা চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছিল। পৌরাণিক বিষয় অবলম্বনে লিথো ছাপা ছবি এই স্টুডিয়োর প্রধান অবদান। আর্টস্কুলে অ্যান্টিক স্টাডির প্রভাব এই-সব লিথোগ্রাফে লক্ষ্য করা যাবে। অপর দিকে লিথো-পদ্ধতিতে ছাপা ভারতীয় মনীষীদের প্রতিকৃতি ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে তাঁরা সক্ষম হয়েছিলেন।

'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি' নামে একখানি শিল্পপত্রিকা এই সময় প্রকাশিত হয়

অন্নদাচরণের উৎসাহে। স্কেচিং ক্লাব, প্রদর্শনী ইত্যাদির নানা পরিকল্পনার দিকে এই শিল্পীগোষ্ঠী লক্ষ দিয়েছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানটির অবসান ঘটে বিদেশী বণিকদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে।

আর্টস্কুলে যাঁরা সে সময় Portrait Painting শিখেছিলেন তাঁদের দিকেই শিক্ষিত সমাজের বিশেষ লক্ষ ছিল। অপর দিকে আর্টস্কুলের কর্তৃপক্ষ এই বিভাগ সম্বন্ধে বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। যদিও শিক্ষক ছাত্র ও শিক্ষিত সমাজ তৈলবর্ণের সাহায্যে প্রতিকৃতি অঙ্কনকে শিল্পের চরম সার্থকতা বলে মনে করতেন। কিন্তু প্রতিকৃতি অঙ্কনের সাহায্যে উপযুক্ত উপার্জন করার সৌভাগ্য সে সময় কম শিল্পীর ভাগ্যেই ঘটেছিল। ধীরে ধীরে ফোটো স্টুডিয়ো তথা ক্যামেরা প্রতিকৃতি-শিল্পীদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। এই কারণে অল্পকালের মধ্যে Portrait Painting ও ফোটোগ্রাফ প্রায় এক স্তরে এসে পৌঁছে এবং বহু ক্ষেত্রে প্রতিকৃতি-শিল্পীরা ব্রোমাইড এনলার্জমেন্ট কাজে লিপ্ত হন। তৎকালীন সমাজের সকল রকমের চাহিদা যুগপৎ আয়ত্ত করার সংকল্প নিয়ে আর্টস্কুলে এই-সব শিল্পীরা আর্টিস্ট্ স্টুডিয়ো প্রতিষ্ঠা করেন। আধুনিক advertisement agencyর প্রথম সূচনা এই প্রতিষ্ঠান।

আর্টিস্ট্ স্টুডিয়ো-প্রকাশিত ছবির চাহিদা সে সময় এতই হয়েছিল যে একদল ইংরেজ বণিক এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেন এবং ইংলণ্ড থেকে সস্তায় ছাপা অনুরূপ ছবি বাজারে সস্তায় চালু হবার ফলে আর্টিস্ট্ স্টুডিয়োর অবসান ঘটে।

এনগ্রেভিং লিথোগ্রাফ তৈলচিত্র ইত্যাদির পরম্পরা এ দেশে ছিল না। এই কারণে এই শ্রেণীর কারিগর বা শিল্পীদের সঙ্গে সমকালীন প্রথানুগত কারিগরদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু মৃৎশিল্পের একটি পরম্পরা সজীব থেকেছে সকল সময়েই। এই কারণে আর্টস্কুলের শিক্ষাপ্রাপ্ত মৃৎশিল্পীদের অবস্থা কিঞ্চিৎ ভিন্ন রকমের হয়েছিল। ছাঁচ নেওয়ার নূতন পদ্ধতি মৃৎশিল্পী মহলে সে সময় যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। প্রতিকৃতি বা মূর্তি-গঠনের ক্ষেত্রে নব্যকালের শিক্ষিত মৃৎশিল্পীদের অবদান যৎকিঞ্চিৎ। বারো-

মাসের তেরো পার্বণের দেশে প্রতিমা, সং ইত্যাদি নির্মাণের সুযোগ-সুবিধা ছিল যথেষ্ট। এই পথেই নব্যভাবাপন্ন মৃৎশিল্পীরা তাঁদের কাজের মাধ্যমে বাস্তবতার আদর্শ প্রচার করার প্রয়াস করেছিলেন কখনো স্বেচ্ছায় কখনো পৃষ্ঠপোষকদের চাহিদায়। যে বাস্তব আদর্শ সে সময় শিল্পী ও রসিক-মহলে জনপ্রিয় ছিল তার উত্তম দৃষ্টান্ত কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প। অপর দিকে পূজাপার্বণ উপলক্ষে এই-সব শিল্পী কিরকম কৃতিত্বের সঙ্গে বাস্তব আদর্শ অনুযায়ী মূর্তি নির্মাণ করতেন তার একটি চিত্তাকর্ষক বিবরণ এখানে উল্লেখ করা গেল—

> "বারোইয়ারি প্রতিমেখানি প্রায় বিশ হাত উঁচু— ঘোড়ায় চড়া হাইল্যাণ্ডের গোরা, বিবি, পরী ও নানাবিধ চিড়িয়া সোলার ফুল ও পদ্ম দিয়ে সাজানো— মধ্যে মা ভগবতী জগদ্ধাত্রীমূর্ত্তি—, সিংগির গা রূপলী গিল্‌টি ও হাতী সবুজ মখমল দিয়ে মোড়া। ঠাকুরুণের বিবিয়ানা মুখ— রং ও গড়ন আসল ইহুদী ও আরমানী কেতা; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ইন্দ্র দাঁড়িয়ে জোড়হাত করে স্তব কচ্চেন। প্রতিমের উপরে ছোট ছোট বিলাতী পরীরা ভেঁপু বাজাচ্চে— হাতে বাদশাই নিশেন ও মাঝে ঘোড়া সিংগিওয়ালা কুইনের ইউনিফরম্‌ ও ক্রেষ্ট।"[২]

আর্টস্কুল-প্রবর্তিত শিক্ষার অনুসরণে বিশ্ববিদ্যালয়-অন্তর্ভুক্ত স্কুলগুলিতে drawing শেখবার ব্যবস্থা শুরু হয় গত শতাব্দীর শেষ অঙ্কে। সে সময় drawing class-এর কোনো স্বতন্ত্র স্থান নির্দিষ্ট ছিল না। Drawing class-এর বিশেষ কোনো সাজসরঞ্জামও তখন ছিল না। অপরাহ্ণে ড্রিল অভ্যাসের পরে drawing class শুরু হত। প্রায়ই ড্রিল ও ড্রয়িং একই শিক্ষক শেখাতেন। অভিজ্ঞ শিল্পী দৈবাৎ স্কুলে নিযুক্ত হতেন। ইংরাজি কপিবুক থেকে হাতের লেখা অভ্যাস করাই ছিল ছাত্রদের প্রধান কাজ।

স্কেল, ডিভাইডার, কম্পাস ইত্যাদির ব্যবহার শিখতে হত। কম্পাস দিয়ে ছোটো বড়ো নানা আকারের বৃত্ত ডিভাইডারের সাহায্যে নির্দিষ্ট ব্যবধানে লাইন টানা ইত্যাদি ছিল drawing classএর দ্বিতীয় পাঠ। ক্রমে কাগজের

---

২ কালীপ্রসন্ন সিংহ -বিরচিত হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা।

উপর যতদূর সম্ভব কড়া পেন্সিলের সাহায্যে পর পর বিন্দু সাজিয়ে সেই বিন্দুগুলি জুড়ে সোজা লাইন টানতে হত। সে কালে এই অভ্যাসের নাম ছিল free-hand drawing।

স্কেল কম্পাস বিন্দুর সাহায্য না নিয়ে সোজা লাইন বা বৃত্ত টানতে পারাই ছিল এই শিক্ষার চরম লক্ষ্য।

ছবি আঁকার সহজাত বৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য ছাত্ররা অনেক সময় ঘরে বা ক্লাসে পাঠ্যপুস্তক থেকে ছবি নকল করতেন। কল্পনা থেকে ছবি করবার সুযোগের চিহ্নমাত্র ছিল না। সম্ভ্রান্ত পরিবারে drawing painting শেখবার জন্য বিশেষ শিক্ষক নিযুক্ত হতেন। এ ক্ষেত্রেও অনুলেখন ছিল শিক্ষার লক্ষ্য। সে সময় মধ্যবিত্ত পরিবারে বিলাতি print মদের বিজ্ঞাপন আঁকা ফ্রেমে বাঁধা আয়না সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার ছবি অনেক পরিবারে স্থান পেয়েছিল। এইসঙ্গে রবি বর্মা, বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বা আর্টিস্ট্ স্টুডিয়ো-দ্বারা প্রকাশিত ছবির উল্লেখ করতে হয়। শৈশবকাল থেকে এই-সব ছবি দেখে নকল করা শিশু ও বালকদের মধ্যে শিল্পশিক্ষা সীমিত ছিল। সংক্ষেপে free activity কথাটি তখনও শিক্ষিত সমাজের কাছে পৌঁছয় নি।

পাশ্চাত্য ছাঁচে ঢালা শিল্পশিক্ষার আদর্শ ও সমাজের বিভিন্ন স্তরে এই শিক্ষার প্রভাব সম্বন্ধে যে আলোচনা করা গেল তারই প্রক্ষেপ বোম্বাই মাদ্রাজ লাহোর আর্টস্কুলে আমরা লক্ষ্য করি।

এই আলোচনার প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বৈঠকখানা বা বাগানবাড়ি সাজাবার জন্যই পাশ্চাত্য শিল্পবস্তুর প্রয়োজন হয়েছিল। এই প্রয়োজনের সঙ্গে ভিতরবাড়ির তথা অন্তঃপুরের শিক্ষা বা রুচির কোনো সম্বন্ধ ছিল না। নূতন শহর যেমন বৃহত্তর ভারতীয় সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন তেমনি শিল্পের এই নূতন শিক্ষা ও সাময়িক রুচি জীবনযাত্রার ব্যাপক পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। এক দিকে পুজো-পার্বণ-ব্রত স্থানীয় দেশীয় কারিগরের অবদানের দ্বারা সম্পূর্ণ হয়েছে, অপর দিকে বিলাসব্যসনের উপকরণ জুগিয়েছে পাশ্চাত্য শিল্পবস্তু ও শিল্পাদর্শ। যে বস্তুর আদর্শ সম্বন্ধে গত শতাব্দীর শিক্ষিত সমাজ প্রভাবান্বিত

হয়েছিলেন সে আদর্শ আজ পাশ্চাত্য জগৎ থেকে সম্পূর্ণ মুছে গিয়েছে। এ দেশেও সে আদর্শের কোনো বিবর্তন ঘটে নি। অপর দিকে নূতন উপকরণ বা কারিগরি শিল্পশিক্ষার ইতিহাসে নিঃসন্দেহে স্থায়ীভাবে প্রভাবান্বিত করতে সক্ষম হয়েছে। অর্থাৎ নূতন উপকরণ ও বিভিন্ন করণ-কৌশল তথা technology-র শক্তিতেই পাশ্চাত্য শিল্প এ দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে সার্থক হয়েছে; আদর্শের দ্বারা নয়।

শিল্প যে বিলাসিতার আনুষঙ্গিক নয়, জাতীয় জীবনে শিল্পের গভীর তাৎপর্য এবং সে তাৎপর্য উপলব্ধি করার জন্য সমকালীন শিল্পশিক্ষার বিধিব্যবস্থা যে অত্যন্ত প্রতিকূল এই কথাটি প্রথম উচ্চারণ করেন আর্টস্কুলের অন্যতম অধ্যক্ষ ই. বি. হ্যাভেল।

২

শিক্ষাব্রতী ই. বি. হ্যাভেল ও অবনীন্দ্রনাথ

ই. বি. হ্যাভেল প্রথম এ দেশে আসেন মাদ্রাজ আর্টস্কুলের অধ্যক্ষরূপে। মাদ্রাজে থাকাকালীন কুটিরশিল্প সম্বন্ধে তিনি নানা রকম অনুসন্ধান ও পরিকল্পনা সরকারের কাছে উপস্থিত করেন। এই পরিকল্পনার মধ্যে সর্বপ্রধান লক্ষ্য ছিল তাঁতশিল্প। তাঁতশিল্প সম্বন্ধে হ্যাভেলের মতামত আলোচনা করার সময় গান্ধীজির চরকা-আন্দোলনের কথা মনে হয়।

ভারতীয় কুটিরশিল্পের জাগরণ ছাড়া এ দেশে শিল্পকলার বিকাশ সম্ভব নয় বলেই হ্যাভেল মনে করতেন। কারিগর-শ্রেণীর মধ্যে যে দক্ষতা ও উদ্ভাবনী শক্তি নিহিত আছে সেটিকে জাগিয়ে তোলা এবং ভারতীয় সমাজকে সে বিষয় সচেতন করার চেষ্টা থেকেই হ্যাভেলের শিল্পশিক্ষার পরিকল্পনাগুলি গড়ে উঠেছে। এই কারণে কুটিরশিল্প সম্বন্ধে হ্যাভেলের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের জেনে রাখা দরকার।

তাঁর মতে ইংরাজ বিশেষজ্ঞের অধীনে কারিগরদের শিক্ষা দেবার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। অবশ্য পশ্চিমে বৈজ্ঞানিক করণ-কৌশল তথা লেবার সেভিং ডিভাইস (Labour Saving Device) অবশ্যই দেশীয় কারিগরদের মধ্যে প্রবর্তন করার প্রয়োজন আছে। এ কথা হ্যাভেল বারংবার স্বীকার করেছেন।

বিদেশী শিক্ষকের কাছে পাঠ নেওয়া সম্বন্ধে হ্যাভেলের প্রচুর আপত্তি থাকলেও দেশী ও বিদেশী কারিগরদের মধ্যে সহযোগিতার পথ মুক্ত করার চেষ্টা তিনি সকল সময়ই করেছিলেন। নয়াদিল্লী পত্তনের কালে হ্যাভেল শেষবারের মতো চেষ্টা করেছিলেন দেশীয় স্থপতিদের এই বৃহৎ পরিকল্পনার মধ্যে স্থান করে দেবার। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর এই চেষ্টা সফল হয় নি। বলা যেতে পারে, শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য সফল হয়ে ওঠে নি। তবে তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন, সেটির যথার্থ মূল্য ভারতবাসী ধীরে ধীরে হৃদয়ঙ্গম করেছেন।

কারুশিল্প জাগিয়ে তোলার উদ্দেশে হ্যাভেলের পরিকল্পনারই পরবর্তী রূপ আর্টস্কুল-অন্তর্ভুক্ত শিল্পশিক্ষার আদর্শ। হ্যাভেল যখন কলকাতা আর্টস্কুলে অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন তখন আর্টস্কুলে নিজস্ব একটি ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, বিশেষভাবে শিল্পী তুভিনের প্রভাব তখন ছাত্র শিক্ষক সকলের মধ্যেই সক্রিয় হয়ে আছে। হ্যাভেল আর্টস্কুলে প্রবর্তিত এই ঐতিহ্যকে কোনোরকম মর্যাদা দেন নি। এই শিক্ষা যে ভারতবাসীর পক্ষে সম্পূর্ণ নিরর্থক এবং পাশ্চাত্য শিল্পের তাৎপর্য উপলব্ধি করার পক্ষেও যে এই শিক্ষা উপযোগী নয় এই কথাটি হ্যাভেল অতি স্পষ্ট ভাষায় সরকারি মহলে উপস্থিত করলেন।

হ্যাভেলের শিল্পচিন্তা সম্বন্ধে যতই অনুসন্ধান করা যায় ততই লক্ষ্য করা যায় যে তিনি শিল্পের সামাজিক মূল্য সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিলেন। ভারতীয় শিল্পের সমাজ-আশ্রিত রূপ, আধ্যাত্মিক সাধনার সঙ্গে ভারত-শিল্পের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ লক্ষ্য করেই হ্যাভেল বলেছেন: "You do not expect Government to understand and aid you in your religious movements. Why should you expect them to understand and keep alive your art?"[১]

হ্যাভেল-প্রবর্তিত আদর্শ ও তৎকালীন শিক্ষিত সমাজে রুচি ও শিল্পচিন্তার মধ্যে পার্থক্য ছিল যথেষ্ট। কারণ হ্যাভেল যে আদর্শ সে সময় উপস্থিত করেছিলেন সেই আদর্শের প্রতি ইংরাজি-শিক্ষিত ভারতীয় সমাজের আস্থা ছিল না। জাতীয় জাগরণের সঙ্গে ধীরে ধীরে হ্যাভেলের শিক্ষানীতি ও তাঁর আদর্শ ভারতবাসীর মনকে প্রভাবান্বিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়েও ভারতবাসী জাতীয় শিল্পশিক্ষার বিধিব্যবস্থা প্রবর্তনে সক্ষম এ কথাটি হ্যাভেল যখন জনসমাজে উপস্থিত করেন তখন জাতীয় শিক্ষাপরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয় নি। জাতীয়তা আধ্যাত্মিকতা এবং শিল্পের ক্ষেত্রে তীব্র সমাজবোধ এগুলির সঙ্গে হ্যাভেলের প্রথম জীবনের শিক্ষার কোনো যোগ

১ *An Open Letter to Educated Indians,* vide Havell's Cuttings, No. 2 Vol. I. 1904, p. 60.

ছিল কি না বলা সম্ভব নয়। তবে, তাঁর চিন্তাধারা অনুসরণ করলে অনুমান করা যায় যন্ত্রশিল্পের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল সেই আন্দোলনের সঙ্গে তিনি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। অপর দিকে, ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার চেষ্টা তিনি করেন।

হ্যাভেল প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন যে তিনি আর্টস্কুল, এক্‌জিবিশন ইত্যাদির উপর আস্থা রাখেন না। এ বিষয়ে তাঁর উক্তি উদ্ধৃত করা গেল—

> "I have no faith in art exhibition, art museums or school of art as agencies for preserving or stimulating the spirituality of Indian art."[১]

এই মনোভাব নিয়ে আর্টস্কুলে গতানুগতিক শিক্ষাকে চালু রাখা যে সম্ভব নয় এ কথা অনুমান করা কঠিন নয়। অধ্যক্ষ হ্যাভেল আর্টস্কুলকে নূতন করে গড়ে তোলার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তার মধ্যে পাশ্চাত্য শিল্পশিক্ষার স্থান অতি সংকীর্ণ হয়ে এল।

আর্টস্কুল প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে ফাইন আর্ট বিভাগের ছাত্ররা কতগুলি বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পেয়েছিলেন। অধিকাংশ ছাত্রকে বেতন দিতে হত না এবং যাঁরা এই বিভাগে যোগ দিতেন তাঁরা সরকারের বৃত্তি পেতেন সহজে। হ্যাভেল ফাইন আর্ট বিভাগের ছাত্রদের এই সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করলেন, পরিবর্তে তিনি ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর আদর্শকে শিক্ষার প্রধান অঙ্গ করে তুললেন, এবং ডিজাইন শিক্ষা আবশ্যিক করেন। আকার, বর্ণ, রেখা এই তিন-এর সমন্বয়ে মিলিত ডিজাইনের বুনিয়াদের উপরেই সকল শিল্পের অস্তিত্ব নির্ভর করে। হ্যাভেল যে সময় ডিজাইন আবশ্যিক করেছিলেন সেই সময় ডিজাইন কথাটির তাৎপর্য সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল শিল্পীসমাজে। প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত না করে ডিজাইন শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয় এ কথা শিক্ষাব্রতী হ্যাভেল জানতেন। এই কারণে কতগুলি কারুশিল্প তিনি আর্টস্কুলে প্রবর্তন করেন যথা— স্টেন্ গ্লাস, ফ্রেস্কো, Gesso work ইত্যাদি। কারিগর ও কারিগরি

Ibid

শিক্ষা সম্বন্ধে অবজ্ঞা পাশ্চাত্য শিল্পশিক্ষার একটি বড়ো রকমের ত্রুটি। এই ত্রুটি এখন সরকার-প্রতিষ্ঠিত আর্টস্কুলগুলিতে তীব্র ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

কাজেই কারিগরি শিক্ষার সম্ভাবনাতে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে শিক্ষাবিলাসী শিক্ষক ও ছাত্রসমাজ খুশি হতে পারেন নি। পাশ্চাত্য শিক্ষাকে সুদৃঢ় করার জন্য সে সময় সরকারি আর্টস্কুলে বিলাতি ছবির সংগ্রহের চেষ্টা চলেছিল। ফলে স্কুল-সংলগ্ন একটি চিত্রশালা গড়ে ওঠে। স্যার রিচার্ড টেম্পল নামে খ্যাত, এই শিল্পসংগ্রহ হ্যাভেল নিলামে বিক্রি করেন এবং দেশী ছবি সংগ্রহ করতে শুরু করেন।

ওরিয়েণ্টাল আর্টের আদর্শ, ডিজাইন ও কারিগরি শিক্ষা, বিলাতি ছবির সংগ্রহ নিলামে বিক্রি— হ্যাভেলের এই কর্মসূচীর প্রভাবে আর্টস্কুলের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দেয়। এই বিক্ষোভের পরিণামে আর্টস্কুলের কিছু প্রাক্তন ছাত্র রণদা গুপ্তের নেতৃত্বে জুবিলি আর্টস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। যে শিক্ষার মূল উৎপাটন করতে হ্যাভেল উদ্‌যোগী হয়েছিলেন, সেই শিক্ষাকে যথাযথ রক্ষা করা এবং পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশের সাহায্যে জনসমাজে এই আদর্শ প্রচার করাই ছিল জুবিলি আর্টস্কুলের প্রতিষ্ঠাতাদের লক্ষ্য। ভারতীয় শিল্পশিক্ষার বিরুদ্ধে এই হল প্রথম শক্তিশালী আন্দোলন।

আদর্শের দিক দিয়ে জুবিলি আর্টস্কুল সরকারি স্কুলের সংকীর্ণ সংস্করণ মাত্র। এই কারণে শিক্ষার ইতিহাসে জুবিলি আর্টস্কুল সম্বন্ধে স্বতন্ত্র আলোচনার প্রয়োজন নেই।

ছাত্র-বিক্ষোভ ও জুবিলি আর্টস্কুলের প্রতিষ্ঠা অধ্যক্ষ হ্যাভেলকে কোনো দিক দিয়ে বিচলিত করে নি। কারণ তিনি জানতেন যে ভারতীয় সমাজ প্রাণহীন পাশ্চাত্য শিল্পরুচির প্রভাবে আচ্ছন্ন। হ্যাভেল যে আর্টস্কুলের ঐতিহ্যকে ভেঙে দিচ্ছেন এ বিষয়টি যত সহজে তৎকালীন শিল্পীসমাজ লক্ষ করেছিলেন তেমনভাবে তাঁর গঠনমূলক পরিকল্পনা লক্ষ করেন নি।

বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রভাবে শিল্পের যে বহির্মুখী গতি সর্বত্র আত্মপ্রকাশ করেছিল সেই গতিকে অন্তর্মুখী করে আধ্যাত্মিক চেতনার সঙ্গে যুক্ত করে

হ্যাভেল ভারতীয় শিল্পের নবজাগরণের সূচনা করেছিলেন। ভারতীয় শিক্ষার আদর্শকে অসহযোগ আন্দোলনের মতো করে তোলার উদ্দেশ্য হ্যাভেলের ছিল না। কারুশিল্পের জাগরণ প্রসঙ্গে যেমন তিনি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি প্রবর্তনে সমর্থক ছিলেন তেমনি শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্রেও পাশ্চাত্য শিক্ষার বিধিব্যবস্থা সম্পূর্ণ বর্জন করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না।

দেশীয় শিল্পশিক্ষাকে প্রাধান্য দিলেও পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতিসাধন করতে হ্যাভেল পরাঙ্মুখ হন নি। সংক্ষেপে অনুকরণধর্মী শিল্পকে তিনি সম্পূর্ণ বর্জন করতেই চেয়েছিলেন। স্থূল বাস্তবতার সঙ্গে পাশ্চাত্য শিল্পের আদর্শের পার্থক্য যে অনেকখানি এ কথা আজ যত সহজে আমরা জেনে নিতে পারি বিংশ শতাব্দীর প্রথমে অনুরূপ মনোভাব দৈবাৎ লক্ষ করা যায়।

অবনীন্দ্রনাথ

সৃষ্টিরত শিল্পীর সান্নিধ্য ছাড়া শিল্পশিক্ষার পরিচালনা যে সার্থক করে তোলা সম্ভব নয় এ কথা হ্যাভেলের জানা ছিল। এই কারণে তিনি সকল সময় প্রতিভাবান শিল্পী বা দক্ষ কারিগরকে আর্টস্কুলের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। আর্টস্কুলের শিক্ষা-পরিকল্পনার ভাঙাগড়ার কাজে হ্যাভেল যখন আত্মনিয়োগ করেছেন, সেই সময় অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে—(১৮৯৭-৯৮) হ্যাভেলের অনুরোধে অবনীন্দ্রনাথ সহকারী অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন।

স্কুল-পরিচালনা সংক্রান্ত কোনো গুরু দায়িত্ব হ্যাভেল অবনীন্দ্রনাথের উপর অর্পণ করেন নি। আর্টস্কুলে বসে ছবি আঁকা এবং হ্যাভেলের কাছ থেকে ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে পাঠ গ্রহণ ছিল অবনীন্দ্রনাথের কাজ। আর্টস্কুলের শিক্ষা-ব্যবস্থার কাজ অসমাপ্ত রেখে হ্যাভেল অসুস্থ অবস্থায় ভারত ত্যাগ করেন ১৯০৬ সালে।

হ্যাভেলের অবর্তমানে অবনীন্দ্রনাথ অস্থায়ী অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। আর্টস্কুলের সর্বময় কর্তারূপে অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষানীতির আলোচনার পূর্বে

উভয়ের শিক্ষানীতি সম্পর্কে সংক্ষেপে তুলনামূলক আলোচনা করে নেওয়া দরকার।

হ্যাভেলের শিক্ষা-আন্দোলনে যে সামাজিক মনোভাবের প্রকাশ আমরা লক্ষ করি অবনীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে অনুরূপ চেতনা লক্ষ করা যায় না। অবনীন্দ্রনাথ নিজে যেমন ভাবে শিল্পের নতুন পথ খুঁজে নিয়েছিলেন তেমনি ভাবেই তিনি ছাত্রদের আপন আপন শক্তি অনুযায়ী শিল্পচর্চা করতে উৎসাহিত করেন। ডিজাইন কারুকর্ম করার যে আবশ্যিক শিক্ষার প্রবর্তন হ্যাভেল করেছিলেন, তার উন্নতিসাধন বা সে ক্ষেত্রে নূতন কোনো পরিকল্পনা অবনীন্দ্র-নাথের শিক্ষানীতিতে পাওয়া যায় না।

হ্যাভেলের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক যোগ ছিল আদর্শের ক্ষেত্রে। ভারত-শিল্পের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে হ্যাভেলের শিক্ষা তিনি অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন, তবে ভারতীয় আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা ভাবগত আদর্শকে তিনি ছাত্রদের সামনে উপস্থিত করার চেষ্টা করেন। অবনীন্দ্রনাথ যখন আর্টস্কুলে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষকের আসন গ্রহণ করেন তখন তিনি বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত। ইতিমধ্যে তিনি পামার গিলার্ডির কাছে রীতিমত পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে শিল্পচর্চা করেছেন। ক্রমে জাপানের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও শিল্পরসিক ওকাকুরা কাকাজুর সান্নিধ্যে জাপানি শিল্পের তাৎপর্য তিনি আয়ত্ত করেছেন। অপর দিকে হ্যাভেলের প্রভাবে ভারত-শিল্পের আধ্যাত্মিক লক্ষণ সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন। এই বিচিত্র প্রভাবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পদৃষ্টি সে সময় যে দিকে প্রসারিত ছিল, সেটি বিশেষ কোনো আদর্শ বা উদ্দেশ্যকে একান্তভাবে অনুসরণ করার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

শিক্ষার ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথের অবদান

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে ভারতবাসীর মনে জাতীয়তার আদর্শ তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। অতীতের ধর্মকর্ম, আধ্যাত্মিক সাধনা একত্রিত হয়ে শক্তিশালী জাতীয় আন্দোলনরূপে যে সময় আত্মপ্রকাশ করে ঠিক সেই মুহূর্তে

ভারতীয় শিল্পধারার অতীত গৌরবকে প্রতিষ্ঠিত করার আয়োজন দেখা দেয়, (১৯০৫) অবনীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে Art Schoolকে কেন্দ্র করে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে হ্যাভেল সর্বপ্রথম ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনার সঙ্গে ভারত-শিল্পের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ স্থাপনের দিকে ভারতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কাজেই আধ্যাত্মিকতা ও জাতীয়তা অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে প্রাচ্য শিল্পশিক্ষাকে সে সময় প্রভাবান্বিত করে।

আর্টস্কুলের সর্বময় কর্তারূপে অবনীন্দ্রনাথের কার্যসূচী বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে শিল্পশিক্ষাকে যান্ত্রিক অভ্যাসের বন্ধন থেকে মুক্ত করাই ছিল তাঁর সর্বপ্রধান লক্ষ্য। তাঁর শিক্ষাদর্শের বিকাশ ও বিবর্তন এই আদর্শকে কেন্দ্র করে কিভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল সে সম্বন্ধে এইবার আলোচনা করা যেতে পারে।

সে সময় আর্টস্কুলে যোগ দিতে হলে ছাত্রদের ম্যাট্রিক বা স্কুল ফাইনালের সার্টিফিকেট উপস্থিত করতে হত না। মানসিক বিকাশের প্রয়োজনীয়তা অবনীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন। পুরাণ, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে পরিচয় হওয়া যে অবশ্য প্রয়োজন এ কথা তিনি বিশ্বাস করতেন। এই কারণে তিনি ছাত্রদের পুরাণ, ইতিহাস এবং অলংকারশাস্ত্রের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি বলেছেন—"Art School Artist গড়িতে পারে না, Artist-এর হাতের সরঞ্জাম জোগাইতে পারে মাত্র। আগে Artist হও তবে Art Schoolএ আসিও। অথবা তুলি কম্পাস[1] মহাস্ত্র বটে কিন্তু তাদের প্রয়োগের মন্ত্রগুলোও সঙ্গে সঙ্গে না শিখিলে কি হইবে।" তুলি কম্পাস চালানোর অভ্যাসে আর্টিস্ট তৈরি হয় না এ সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস থাকার কারণে অবনীন্দ্রনাথ ছাত্রদের সামনে কোনো নির্দিষ্ট শিক্ষাব্যবস্থা উপস্থিত করেন নি।

১ অবনীন্দ্রনাথ বহু জায়গাতেই তুলি কম্পাস, স্কেল কম্পাস শব্দগুলির ব্যবহার করেছেন। যন্ত্রচালিতবৎ সৃষ্টির প্রতি কটাক্ষ করেই তিনি প্রধানত এই রকম উক্তি করতেন। আর্টস্কুলের ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যানশিপ কোর্স বা অন্য কোনো শিক্ষাপদ্ধতিকে ইঙ্গিত করে কোথাও এ কথা বলা হয় নি। এটি তাঁর বলবার একটি বিশেষ ধরন বলা যেতে পারে।

অবনীন্দ্রনাথ শিল্পীর মন নিয়ে শিল্পশিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছিলেন। অপর দিকে হ্যাভেলের শিক্ষাপদ্ধতির হুবহু অনুসরণ তিনি যে করেন নি সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই কারণে নিজের ইচ্ছানুযায়ী চিত্ররচনার স্বাধীনতা ছাত্ররা প্রথম থেকেই পেয়েছিলেন। শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্রে স্বাধীন পরিবেশের উপযোগিতা সম্বন্ধে আজ শিক্ষাব্রতী মাত্রই সচেতন। যে সময় অবনীন্দ্রনাথ এই পথ অনুসরণ করেছিলেন সে সময় শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্রে এই আদর্শ সম্পূর্ণ নূতন। বলা যেতে পারে, শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্রে এই হল প্রথম পরীক্ষা-নিরীক্ষার চেষ্টা। যেমন অনায়াসে তিনি সৃষ্টির পথ খুঁজে নিয়েছিলেন তেমনি করেই ছাত্ররা নিজের নিজের প্রতিভা-অনুযায়ী শিল্পসৃষ্টির পথ অনুসরণ করবে, এই ছিল অবনীন্দ্রনাথের শিল্পশিক্ষার আদর্শ।

প্রত্যেক শিল্পীকে পরম্পরার সাহায্যে অথবা ব্যক্তিগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা আঙ্গিক আয়ত্ত করতে হয়। এই প্রয়োজনীয় শিক্ষাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। অবনীন্দ্রনাথ পরম্পরার অনুশীলন বাধ্যতামূলক করেন নি ; কাজেই শিল্পীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অবশ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে কে কতটা কৃতকার্য হয়েছিলেন সে কথা এ ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক।

অবনীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ উপলব্ধির পথে শিল্পসৃষ্টির নূতন পথ অনুসন্ধান করেছিলেন, এই কারণে তিনি শিল্পী মন জাগিয়ে তোলারই চেষ্টা করেছেন। আঙ্গিকগত সমস্যা সমাধান প্রত্যেক শিল্পীকে নিজে করে নিতে হয়, এই সত্যটি অবনীন্দ্রনাথ নিজে প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলেই আঙ্গিক চর্চার কোনো নির্দিষ্ট পথে তিনি তাঁর ছাত্রদের চালিত করেন নি। বলা যেতে পারে, শিল্পী-মন জাগলেই আঙ্গিক আপনা থেকে শিখে নেওয়া যাবে— এই ছিল অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষার লক্ষ্য।

তবে সকল শিল্পীর মন সমানভাবে জাগে না, তাই অভ্যাসের পথে শিল্পী-মনকে জাগিয়ে তুলতে হয়, এই অভ্যাসগত শিক্ষারই অপর নাম আঙ্গিকের চর্চা। কাজেই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অবনীন্দ্রনাথকে আঙ্গিকগত বিষয় হাতে-কলমে শেখাতে হয়েছিল।

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর শিষ্যবর্গকে নিজের শিল্পরীতি অনুকরণ করতে বাধ্য না করলেও ছাত্ররা তাঁকে প্রথম থেকেই গ্রহণ করেছিলেন আদর্শরূপে। এবং জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে তাঁর অঙ্কন-পদ্ধতিকে তাঁরা অনুসরণ বা অনুকরণ করেন। চিত্রের বাহ্যিক রূপ যেমনই হোক ভাবের মৌলিকতা সম্বন্ধেই অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যবর্গ তখন বিশেষ সচেতন। কারণ অবনীন্দ্রনাথের মতে সৌন্দর্য অন্তরের বস্তু।

বিচিত্র রূপের সাহায্যে ভাব প্রত্যক্ষ করে তোলাই ছিল সে সময় তরুণ শিল্পীদের লক্ষ্য। নিপুণ অভিনেতা অবনীন্দ্রনাথ সাহিত্যধর্মী বর্ণনা ও নাটকীয় ভঙ্গির সাহায্যে ছাত্রদের চিত্রিত বিষয়ের ভাবরূপ লক্ষ্যগোচর করবার একান্ত নিজস্ব উপায় এই সময় উদ্‌ভাবন করেছিলেন। অপর দিকে পৌরাণিক বিষয়মূলক নায়ক-নায়িকাদের চরিত্র তিনি খুঁজে নিতে বলেছিলেন কলিকাতা শহরের জনতা থেকে। যখন কথাবার্তা ভাবভঙ্গির সাহায্যে ছাত্রের মনের ভাবকে স্পষ্ট করে তোলা সম্ভব হয় নি সে ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ কাগজের উপর সংশোধন করে দিয়েছেন। কিন্তু এইভাবে সংশোধন অবনীন্দ্রনাথের প্রকৃতিগত ছিল না। বলা যেতে পারে, রূপ নির্মাণের ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথের প্রভাব তেমন লক্ষ করা যায় না। যে-সব শিল্পী রূপনিষ্ঠ চিত্র রচনার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাঁরা মিউজিয়ম-সংলগ্ন গ্যালারি থেকে মূর্তি বা চিত্রের অনুশীলন করেছিলেন। অপর দিকে অবনীন্দ্রনাথের সহকারী শিল্পী ঈশ্বরী প্রসাদের কাছে প্রথানুগত করণ-কৌশল চর্চা করেন নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

বর্ণ-প্রয়োগের ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষার প্রভাব অনেক পরিমাণে স্পষ্ট। জল-রঙের আঙ্গিক তিনি রীতিমত শিক্ষা করেছিলেন। অনুরূপ শিক্ষা তাঁর ছাত্রদের ছিল না। জল-রঙের ব্যবহার-রীতি ছাত্রদের প্রায় সময়েই অবনীন্দ্রনাথের কাছ থেকে হাতে-কলমে জেনে নিতে হয়েছে। বর্ণের স্তরভেদ, বর্ণদ্যুতি (texture), ছবির ফিনিস্, বর্ণের মিশ্রণ, বর্ণলেপন-রীতি অবনীন্দ্রনাথের মধ্যস্থতায় তাঁর অনুবর্তীরা আয়ত্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। ছাত্রদের ছবির উপর ওয়াশ দিয়ে দেওয়ার কথা অবনীন্দ্রনাথ নিজেই উল্লেখ করেছেন।

অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা চিত্রধর্মী। ভাবলাবণ্য বর্ণের মাধ্যমেই প্রকাশ

পেয়েছে অবনীন্দ্রনাথের চিত্রে। ভাবলাবণ্যের চিত্রধর্মী ব্যাখ্যারূপেই অবনীন্দ্রনাথ তাঁর অনুবর্তীদের বর্ণের উপযোগিতা সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েছেন। ছবির ফিনিস্ সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ বিশেষ সচেতন থেকেছেন। তিনি বলেন যে "ছবি যখন ফিনিস হবে তখন কাগজ সোনার পাতের মতো মূল্যবান হবে। ছবির প্রতি অংশ কেটে নিলেও স্লেটির দাম হবে সোনার পাতের মতো"। ফিনিস শিখবার জন্ম অবনীন্দ্রনাথ সকল ছাত্রকেই মোঘল চিত্রকলা অনুশীলন করতে বলেন। আঙ্গিকের ক্ষেত্রে এই তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ। ছবির উপর ওয়াশ, ফিনিসিং ও বিশেষভাবে মোঘল চিত্রের অনুশীলন এই তিন-এর সমন্বয়ে অবনীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত আঙ্গিক শিক্ষার বুনিয়াদ গড়ে উঠেছে।

ভাবের ক্ষেত্রে এক হয়েও অবনীন্দ্রনাথের অনুবর্তীরা দুই অংশে বিভক্ত। যে-সব শিল্পী রূপনিষ্ঠ চিত্ররূপ নির্মাণের প্রতিভা নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা প্রথম থেকে ভারতীয় শিল্পের আঙ্গিক অনুশীলনের চেষ্টা করেন। আকার, বর্ণ, রেখা সকল দিক দিয়েই এই-সব শিল্পীরা পরম্পরাপন্থী। অপর দিকে দেখি অবনীন্দ্র-নাথের বর্ণরীতির যথাযথ অনুসরণ বা অনুকরণের চেষ্টা। সাহিত্যগত ভাব, অ্যালিগরি ইত্যাদির সাহায্যে ভাবময় চিত্ররচনাই ছিল এইসব শিল্পীদের লক্ষ্য।

উপরে বর্ণিত আলোচনা থেকে এই মীমাংসা করা চলে যে অবনীন্দ্রনাথ শিখিয়ে পড়িয়ে শিল্পী তৈরি করার চেষ্টা করেন নি। যাঁরা শিল্পীমন নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের দ্বারা যতটা উপকৃত হয়েছিলেন অপেক্ষাকৃত সাধারণ শিক্ষার্থীর পক্ষে এই শিক্ষানীতি তেমন কার্যকর হয় নি। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা দরকার অবনীন্দ্রনাথ সে সময় বহুসংখ্যক শিক্ষার্থীর তত্ত্বাবধান করেন নি।

ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্ট

ভারতীয় পদ্ধতিতে শিল্পশিক্ষার উদ্‌যোগ-আয়োজনকে জনপ্রিয় করে তোলার উদ্দেশে প্রাচ্য শিল্পসভা প্রতিষ্ঠিত হয় (১৯০৭)। এই সভারই পরবর্তী নাম Indian Society of Oriental Art। এই সভার উদ্‌যোগে

শিল্পপ্রদর্শনী ও শিল্প-সমালোচনার সূচনা হয়। সভার উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন বিচারপতি উড্রফ, ভগিনী নিবেদিতা, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইত্যাদি। সেই সময় যাঁরা এই সভার পৃষ্ঠপোষকতা বা শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেছিলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন জাতীয়তাবাদী ও ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনার প্রতি গভীর আস্থাবান। সোসাইটির কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার কালে হ্যাভেল বলেন—"... In painting a great deal might be done in discovering the few remaining representatives of the old Indian school of painting and giving them work to do in their own way instead of killing their art by teaching them European ideas"...[১]

অতীত ও বর্তমানের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন এবং অন্যান্য গুরুতর সমস্যা সমাধানের চেষ্টা অপেক্ষা অবনীন্দ্র-পরম্পরাকে জনপ্রিয় করা ও অবনীন্দ্র-গোষ্ঠীভুক্ত তরুণ শিল্পীদের আর্থিক সমস্যা থেকে রক্ষা করার দিকে সোসাইটির কর্তারা বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছিলেন।

শিল্প-সমালোচনার নূতন আদর্শ সোসাইটির পৃষ্ঠপোষকদেরই কীর্তি। ভগিনী নিবেদিতা, উড্রফ্, জেম্স্ কাজিন এবং অবনীন্দ্রনাথের দ্বারা শিল্প-সমালোচনার যে নূতন আদর্শ দেখা দিয়েছিল সেটি দীর্ঘকাল পর্যন্ত ভারতীয় রসিকসমাজে আদর্শরূপে গৃহীত হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন, সোসাইটির ক্যাটালগে প্রত্যেক ছবির সঙ্গে চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দেওয়া হত। এইভাবে চিত্র ও সাহিত্যগত ভাব একত্রে দেখবার ও জানবার অভ্যাসের প্রবর্তন করেন সোসাইটির পৃষ্ঠপোষকরা।

লেডি হেরিংহামের সহকারী-রূপে নন্দলাল ও অসিতকুমার প্রমুখ তরুণ শিল্পীরা অজন্তায় প্রেরিত হন ১৯০৯ সালে। এই পরিকল্পনার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। এ পর্যন্ত শিল্পীরা অজন্তার ছবি দেখেছিলেন গ্রিফিথস্-এর অজন্তা বই থেকে। এই পুস্তকের সাহায্যেই নন্দলাল সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ শিল্পীরা মণ্ডনধর্মী গুণ আয়ত্ত করার চেষ্টা করেন।

---

১ Kala-Bhavana Cuttings Collection of E. B. Havell's cuttings Vol. II.

ভারতের অনবদ্য সৃষ্টি অজন্তা ভিত্তিচিত্রের বিরাট পরিকল্পনার সামনে উপস্থিত হয়ে তরুণ শিল্পীরা নূতন কিছু উপলব্ধি করেছেন কি না তা জানবার বিষয়। অবশ্য লেডি হেরিংহামের কাছ থেকে এই-সব শিল্পীরা অনেক কিছু শিখেছেন। ইতালীয় egg টেম্পেরা লেডি হেরিংহামের মধ্যস্থতায় আধুনিক শিল্পের করণ-কৌশলরূপে প্রবর্তিত হয়। হেরিংহাম শিল্পীদের অজন্তার আঙ্গিকগত বিশেষত্ব যথা অ্যানাটমি, পার্স্পেকটিভ্ ইত্যাদি সম্বন্ধে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, কারণ নন্দলাল প্রমুখ শিল্পীদের মনে তখনও সন্দেহ ছিল অজন্তার ভিত্তিচিত্রের রূপ নির্মাণ-রীতি সত্যই নির্ভুল কি না। দেখা গেল গতানুগতিক শিক্ষা না থাকলেও অজন্তার ভিত্তিচিত্রের অনুলেখন শিল্পীরা সুষ্ঠুভাবেই করতে সক্ষম হন।

অজন্তা ভ্রমণের পর নন্দলালের চিত্রে অজন্তার নির্মাণ-রীতির প্রভাব ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করে।

অবনীন্দ্রনাথের মুখের কথা ক্রমে ছোটো বড়ো প্রবন্ধ-আকারে পত্রিকায় প্রকাশিত হতে শুরু হয় ১৯০৪-১৯০৫ সালের মধ্যে। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি সংকলিত হয়ে "ভারতশিল্প" নামক পুস্তকে স্থান পায়। এই বই-খানিতে হ্যাভেলের শিল্পচিন্তার প্রভাব নানা স্থানে লক্ষ করা যাবে। শিল্পীর স্বাধীনতা, গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ, শিল্পদৃষ্টি, আর্টস্কুলের উপযোগিতা ও ব্যর্থতা সম্বন্ধে আলোচনাগুলি অনুসরণ করলে আচার্য অবনীন্দ্রনাথের তৎকালীন মনোভাব সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করে নেওয়া যায়।

ভারতীয় শিল্পের মহত্ত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ সারনাথ বুদ্ধমূর্তির উল্লেখ করেছেন। ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে অনুরূপ উল্লেখ অবনীন্দ্রনাথের পরবর্তী শিল্পবিষয়ক আলোচনাতে দৈবাৎ পাওয়া যায়। উক্ত শিল্প সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা না থাকলেও ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনার কথা অবনীন্দ্রনাথ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন এই পুস্তকে। শিল্পীর স্বাধীনতাকে তিনি যোগী পরমহংসের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে বলেছেন— সার্থক শিল্পের প্রয়োজন সিদ্ধ মহাপুরুষের অনুরূপ স্বাধীনতা। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অথবা শিল্পচিন্তার

ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ যে বারংবার পরম্পরার বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার প্রয়াস পেয়েছিলেন তার যথেষ্ট প্রমাণ এই পুস্তকখানিতে পাওয়া যাবে।

ইতিমধ্যে ই. বি. হ্যাভেলের *Indian Sculpture and Painting* এবং কুমারস্বামীর ভারত-শিল্প সম্বন্ধে গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছে। এই-সব পুস্তকের সাহায্যে ভারত-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সম্বন্ধে মতবিরোধ অনেক পরিমাণে দূর হয়েছে। অবনীন্দ্র-পরম্পরার ধারকদের পক্ষে ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করে নেওয়ার পথ অনেক পরিমাণে সুগম হয়েছে।

হ্যাভেলের শিক্ষা-পরিকল্পনা অথবা অবনীন্দ্রনাথের উদার শিক্ষানীতির প্রভাব সত্ত্বেও কী কারণে অবনীন্দ্র-পরম্পরা সংকীর্ণ হয়ে এসেছিল সেটি এইবার অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

অবনীন্দ্রনাথের বাসভবন ও শিল্পচর্চার নূতন পরিবেশ

আর্টস্কুলে অধ্যক্ষের ভার গ্রহণের ছয় বৎসর পরে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে আর্টস্কুলের সম্বন্ধ ছিন্ন হয়। পার্শিব্রাউনের অধীনে আর্টস্কুলে নূতন উদ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার উদ্‌যোগ-আয়োজন শুরু হয় শিল্পী যামিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের সহযোগিতায়। ভারতীয় শিল্প-বিভাগের ভার ন্যস্ত হয় লালা ঈশ্বরী প্রসাদের উপর। লক্ষ করলে দেখা যায়, হ্যাভেল বা অবনীন্দ্রনাথের প্রভাবে দেশের মধ্যে ভারত-শিল্প সম্বন্ধে আগ্রহ জাগলেও আর্টস্কুলের মধ্যে এই আন্দোলনের প্রভাব অথবা নূতন আদর্শ হ্যাভেল বা অবনীন্দ্রনাথ সক্রিয় করে তুলতে পারেন নি। "কলোনিয়াল আর্ট"-এর দুর্গরূপে সরকার-প্রতিষ্ঠিত আর্টস্কুলগুলিকে সকল সময় বাইরের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখবার চেষ্টা হয়েছে। আজও এই অবস্থার বড়োরকম ব্যতিক্রম ঘটে নি।

আর্টস্কুলের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন হওয়ার মুহূর্ত থেকে অবনীন্দ্রনাথের বাসভবন শিল্প-শিক্ষার্থীদের প্রধান আকর্ষণের স্থান হয়ে ওঠে।

অবনীন্দ্রনাথের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তাঁর উদার শিক্ষানীতি এবং তাঁর সংগ্রহালয় সব মিলে তৎকালীন শিল্পীমহলে যে নূতন উদ্দীপনা জাগিয়েছিল

তারই প্রভাবে সমাজের নানা স্তর থেকে শিল্পসৃষ্টির ইচ্ছা নিয়ে অবনীন্দ্রনাথের বাসভবনে বৃহৎ জনতার সমাগম হয়।

ছাত্র শিক্ষক ও সরকারি চাকুরে সকলেই ভারতীয় শিল্পচর্চা করতে ইচ্ছুক। ইচ্ছুক ব্যক্তি মাত্রই ঘরে বসে ছবি এঁকে অবনীন্দ্রনাথের কাছে উপস্থিত হতে পারতেন, এবং অবনীন্দ্রনাথের কাছ থেকে শিল্পবিষয়ক উপদেশ গ্রহণ করতেন।

বলা চলে যে আর্টস্কুলে প্রাচ্য শিল্পবিভাগ অপেক্ষা অবনীন্দ্রনাথের বাসভবন সে সময় শিল্পশিক্ষা পদ্ধতির প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল। পাশ্চাত্য শিল্পের অন্ধ অনুকরণ থেকে মুক্ত করা এবং ভারতীয় শিল্পের আধ্যাত্মিকভাব সম্বন্ধে সচেতন করা ছিল ই. বি. হ্যাভেলের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য অনুসরণ করে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পশিক্ষার পরিকল্পনা রূপ নিয়েছিল।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে অবনীন্দ্রনাথের প্রভাব প্রথম থেকেই দুই ধারায় বিভক্ত। একটি পরম্পরামুখী, অপরটি অবনীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ অনুকরণ-ধর্মী ও সাহিত্যভাবাপন্ন। প্রধানত যে-সব শিল্পীদের ক্ষেত্রে সাহিত্যের প্রভাব অধিক, বিশেষভাবে যাঁরা তৎকালীন রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত, তাঁদের প্রভাবে অবনীন্দ্র-শিল্পধারা ভারতীয় পরম্পরা থেকে অনেকখানি দূরে চলে গিয়েছে, এই-সব শিল্পীরা ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের অনুকারক। এক দিকে ভারত-শিল্পের পরম্পরা অপর দিকে অবনীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব, এই দুই গতির সংযোগস্থলে আমরা লক্ষ করি জাপানি প্রভাবের ক্রিয়া।

জাপানি প্রভাব

জাপানি পরম্পরার প্রভাব অবনীন্দ্র-গোষ্ঠীতে প্রবেশ করেছিল জাতীয়তার পথ ধরে। ভারত ও জাপান এই দুই সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধে শিল্পীসমাজকে প্রথম সচেতন করেন ওকাকুরা কাকাজু।

ওকাকুরার সংস্পর্শে এসে (১৯০১-১৯০২) অবনীন্দ্রনাথ জাপানের আদর্শ অনুযায়ী রেখাঙ্কন চর্চা করেছিলেন। এই হল প্রথম জাপানি শিল্পীর কাছে ভারতীয় শিল্পীর পাঠগ্রহণ। ক্রমে ইউকোহামা টাইকান, হিসিডা, খাৎসুতা

ইত্যাদি জাপানি শিল্পীদের গতায়াত শুরু হয়। এই-সব শিল্পীদের প্রভাব স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়— সোসাইটির উদ্‌যোগে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীর পর (১৯০৮)।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পাশ্চাত্য রুচির গৃহসজ্জা তৈলচিত্র ইত্যাদির পরিবর্তে জাপানি চিত্র ও জাপানি ধরনের গৃহসজ্জার প্রবর্তন এই প্রভাবের সর্বপ্রথম ও প্রধান অবদান।

ভারতীয় সংস্কৃতির জাগরণ সাহিত্যে শিল্পে দর্শনে ও তত্ত্বজিজ্ঞাসায় আত্মপ্রকাশ করা সত্ত্বেও জীবনযাত্রাকে কালোপযোগী করে তোলার পথ তখনও সুগম হয় নি। জাপান জীবনযাত্রার নূতন আদর্শ প্রথম বাঙালি সমাজের সামনে উপস্থিত করলেন। জাপানের শিল্পানুরাগ তখন কিংবদন্তীর মতো পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়েছে। নবজাগ্রত রুশ-বিজয়ী জাপানের অসাধারণ শৌর্য, বীর্য, স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীকে মুগ্ধ করেছে। ভারত ও জাপানের মধ্যে সংস্কৃতির যোগ ইতিমধ্যে ওকাকুরার মধ্যস্থতায় ঘটেছে। তাই ভারত-বাসীর পক্ষে তখন জাপানের অনুকরণ বা অনুসরণ করার মধ্যে কোনো গ্লানি বোধ ছিল না।

ওকাকুরা দ্বিতীয়বার যখন এ দেশে আসেন তখন অবনীন্দ্র-পরম্পরা একটি নির্দিষ্ট আকার পেয়েছে (১৯১০)। নূতন শিল্পীগোষ্ঠী সম্বন্ধে ওকাকুরার কোনো মন্তব্য পাওয়া যায় না। তবে শিল্প ও শিল্পবিচার সম্বন্ধে ওকাকুরার কতগুলি উপদেশ অবনীন্দ্র-পরম্পরার মধ্যস্থতায় পরবর্তীকালে শিক্ষানীতিকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। এই কারণে ওকাকুরার মন্তব্যগুলির কিঞ্চিৎ বিবরণ এখানে দেওয়া গেল।

"Asia is one" এই বাণী বহন করে ওকাকুরা যখন এ দেশে আসেন তখন অবনীন্দ্রনাথের কাছে ছাত্ররা সমবেত হন নি। অবনীন্দ্রনাথের প্রথম অনুবর্তীদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় দ্বিতীয়বার ভারত আগমনের পর (১৯১০)। অবনীন্দ্রনাথের অনুবর্তীরা যখন ওকাকুরার কাছে শিল্প সম্বন্ধে উপদেশ চান তখন তিনি বলেন শিল্পের গভীর তত্ত্ব উপলব্ধি করার উপযুক্ত অভিজ্ঞতা

এই-সব ছাত্রদের নেই, কারণ তারা ছেলেমানুষ, অনভিজ্ঞ। কাজেই ওকাকুরা শিল্পরচনার বিষয় নন্দলাল, অসিতকুমার প্রমুখ শিল্পীদের কাছে সাধারণভাবে আলোচনা করেন।[১]

শিল্পের বিষয়ে যে-সব আলোচনা তিনি করেছিলেন তার আভাস অবনীন্দ্রনাথ, অসিতকুমার ও নন্দলালের রচনাতে পাওয়া গেলেও সম্পূর্ণভাবে এই বিষয়ে নির্ভুল তথ্য উপস্থিত করা সম্ভব নয়। নন্দলালের মুখে শোনা কথার উপর নির্ভর করে ওকাকুরার উপদেশগুলি এখানে সাজিয়ে দেওয়া গেল।

অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন ওকাকুরা দেশলাই কাঠি সাজিয়ে কম্পোজিশন শেখাতেন। দেশলাই কাঠির সাহায্যে সম্ভবত ওকাকুরা জাপানি শিল্পের surface tension বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। দেশলাইএর কাঠি সাজিয়ে কম্পোজিশন বোঝাবার কালে তিনি দুরকম কম্পোজিশনের কথা উল্লেখ করেন। দুর্বল কম্পোজিশনের সঙ্গে সরীসৃপের তুলনা করেন। তাঁর মতে, এই শ্রেণীর ছবি দুই-তিন টুকরা করলেও তার স্বতন্ত্রতা বজায় থাকে। উত্তম কম্পোজিশনকে তিনি মানুষের শরীরের সঙ্গে তুলনা করেন। মানুষের শরীরের কোনো অংশে ছুঁচ ফোটালে যেমন সমস্ত শরীর সেই আঘাতে সচকিত হয়ে ওঠে তেমনি ভালো কম্পোজিশনের ক্ষুদ্র অংশ কেটে নিলে সমস্ত ছবি এই ক্ষুদ্র অংশের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বর্ণপ্রয়োগ সম্বন্ধে ওকাকুরা বলেন স্নান করার পর শরীরের যে শুদ্ধতার ভাব আমরা অনুভব করি, উত্তম রঙিন ছবির সামনে দাঁড়ালে মনের অনুরূপ শুদ্ধতা বোধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রসঙ্গক্রমে তিনি নন্দলাল রচিত অগ্নি ছবিটি দেখিয়ে বলেন যে আকারে ভঙ্গিতে চিত্রিত রেখাযুক্ত আগুন পরিপাটীভাবে শিল্পী এঁকেছেন, কিন্তু চিত্রিত আগুনের উত্তাপ নেই। যতদূর অনুমান করা যায় বস্তুসত্তার প্রকৃতিভেদে বস্তুর নিজস্ব ধর্ম সম্বন্ধে ওকাকুরা ইঙ্গিত করেছিলেন। ভাবের উপযোগিতা যথেষ্ট থাকলেও আঙ্গিকের পরাকাষ্ঠা ছাড়া শিল্পরূপ

---

১ ওকাকুরার নন্দনতাত্ত্বিক উপলব্ধির যে গভীরতা, তার পরিচয় পাওয়া যাবে তাঁর *Heart of Heaven* নামক বিখ্যাত গ্রন্থটিতে।

পূর্ণতা পায় না। এই উক্তির সঙ্গে ওকাকুরা ছবি দেখা সম্বন্ধে মন্তব্য করেন। তিনি জানালেন ছবির পূর্ণাঙ্গ আবেদন দেখতে হয় দূর থেকে। আঙ্গিকের দক্ষতা বুঝতে হয় ছবির কাছে গিয়ে।

তরুণ শিল্পীদের রচনায় ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের উপায়রূপে তিনি জাপানি শিল্পের একটি মূলতত্ত্ব শিল্পীদের সামনে উপস্থিত করেন। তিনি জানালেন যে শিল্পীজীবনের পূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজন Tradition, 'Nature', Originality এই তিন-এর সমন্বয়। এই সূত্রের ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের অভাবে শিল্পরূপ পুনরাবৃত্তিতে পরিণত হয়। পরম্পরার অভাবে শিল্পরূপ হবে অপরিণত ও অমার্জিত। মৌলিকতার অভাবে শিল্প হবে প্রাণহীন। মৌলিকতা সম্বন্ধে চীন বা জাপান শিল্পশাস্ত্রে যে আলোচনা আছে তা থেকে লক্ষ্য করা যায় মৌলিকতা বলতে জীবনের স্পন্দন বা মৌলশক্তির প্রকাশ তাঁরা বুঝেছিলেন। ব্যক্তিগত প্রতিভার আশ্রয় ব্যতীত এই শক্তির প্রকাশ সম্ভব নয়। জাপানি শিল্পপ্রতিভার উজ্জ্বল প্রকাশ চিত্রকলার ক্ষেত্রে। অপর দিকে ভারতীয় শিল্পের পরাকাষ্ঠা মূর্তিকলার ক্ষেত্রে। এই কারণে ওকাকুরা তৎকালীন শিল্পীদের ভারতীয় মূর্তিকলার চর্চা করতে উপদেশ দেন। ওকাকুরার উক্তিগুলি যে ভাষায় বলা হল সংযত স্বল্পভাষী ওকাকুরা এই কথাগুলি আরো সংক্ষিপ্ত ও সূত্ররূপে বলেছিলেন এই অনুমান করাই সংগত।

অবনীন্দ্রনাথ যখন ওকাকুরার কাছে খাৎসুতার চিত্র সম্বন্ধে মতামত জানতে চান তখন ওকাকুরা বলেন "খাৎসুতা ইজ্ খাৎসুতা" এই উক্তিতে ধরা পড়েছে ওকাকুরার বলবার ভঙ্গি।[১]

অবনীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথ প্রমুখ শিল্পীদের রচনাতে জাপানি কায়দায় নামাঙ্কিত সীল লাগাবার রেওয়াজ জাপানি প্রভাবের অন্যতম প্রকাশ। অবশ্য মোঘল ছবিতে নামাঙ্কিত সীল ব্যবহার করা হয়েছে। এই-সব সীলমোহর ছবির বাঁধুনির সঙ্গে যুক্ত নয়। অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুবর্তীরা শিল ব্যবহার

১ ওকাকুরার উক্তির সঙ্গে যে ব্যাখ্যাগুলি উপস্থিত করা হয়েছে. সেগুলির জন্য লেখক দায়ী।

করেছিলেন ছবির বাঁধুনির দিক দিয়ে। চীনে অক্ষর খোদাই করা সীল অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের চিত্রে যে দেখা যায় সেটি ওকাকুরা তাঁদের উপহার দিয়েছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার সঙ্গে ওকাকুরার শিল্পচিন্তার সংযোগের স্মারক-চিহ্নরূপে উল্লেখ করা যেতে পারে অবনীন্দ্রনাথ-কৃত ষড়ঙ্গ পুস্তকের। ভারত ও জাপানের শিল্পদৃষ্টির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিচার করাই প্রধানত এই আলোচনার লক্ষ্য ছিল। তবে এই ব্যাখ্যা অবনীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত রুচি মেজাজের দ্বারাই বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত। এক দিকে জাপানি ধরনের গৃহসজ্জা, অপর দিকে ষড়ঙ্গের তুলনামূলক আলোচনা উভয়ের মাঝখানে পাওয়া গেল জাপানি চিত্রকরদের প্রভাব ও তরুণ শিল্পীদের প্রতি ওকাকুরার উপদেশ।

ইতিমধ্যে অবনীন্দ্রনাথ-রচিত ভারত-শিল্পের কথা অনেকে বিস্মৃত হয়েছেন। তাঁর নূতন শিল্পচিন্তার প্রতীকরূপে দেখা দিল ভারত-শিল্পের ষড়ঙ্গ।

ইতিমধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে। জাপানের উৎপন্ন দ্রব্যে ভারতবর্ষের বাজার তখন ভরে গেছে। এক সময় ইংরেজের বাণিজ্য শিল্প যেমন ভারতবর্ষের রুচির ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছিল, অনুরূপ ভাবে জাপানি শিল্পবস্তুর আকর্ষণে শিক্ষিত ভারতবাসীর রুচি মেজাজ বদলে চলেছে অতি দ্রুতভাবে। মহাযুদ্ধের পূর্বে জাপানের শিল্পসংস্কৃতি শিক্ষিত মনকে আকৃষ্ট করেছিল। মহাযুদ্ধের কালে জাপান আকৃষ্ট করল অপেক্ষাকৃত সাধারণ সমাজকে।

বিচিত্রা সভা

মহাযুদ্ধের সময় শিল্প ও সাহিত্যকে কেন্দ্র করে ভারতীয় সংস্কৃতিকে নূতন পথে চালিত করার উদ্‌যোগ-আয়োজন দেখা দেয় বিচিত্রা সভার কালে। অভিনয় সংগীত সাহিত্য ইত্যাদির সহযোগিতায় সভাস্থাপন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের বৈশিষ্ট্য। বিচিত্রা সভা এই পুরাতন আদর্শেরই পুনরাবৃত্তি।

বিচিত্রা সভার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করলেন অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ। এই সভার প্রধান অবদান

সাহিত্যের ক্ষেত্রে। অপর দিকে শিল্পচর্চার উপযুক্ত পরিবেশ দেখা দিল বিচিত্রা সভাকে কেন্দ্র করে।

নন্দলাল, অসিতকুমার ও আমেরিকা-প্রত্যাগত তরুণ শিল্পী মুকুলচন্দ্র দে বিচিত্রা সভার সভ্য হলেন। মহিলাদের মধ্যে শিল্পচর্চার আগ্রহ এই সময় দেখা দিল। মুকুলচন্দ্র আমেরিকা থেকে এচিং সম্বন্ধে ছয়মাস শিক্ষা করে ফিরেছেন। এচিং-পদ্ধতি ভারতীয় শিল্পের অঙ্গরূপে প্রথম স্বীকৃত হল এবং মুকুলচন্দ্র অবনীন্দ্রগোষ্ঠীর অন্যতম শিল্পীরূপে পরিচিত হলেন।

বিচিত্রা সভার কালে বাংলার কুটিরশিল্প সম্বন্ধে আগ্রহ দেখা দেয় এবং গ্রাম্য শিল্পের একটি সংগ্রহালয় এই সময় গড়ে ওঠে। অবনীন্দ্রনাথের বাংলার ব্রত নামে আল্‌পনা-সংক্রান্ত প্রামাণিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয় বিচিত্রা সভার উদ্‌যোগে।

এই সভার সূচনাকালে কম্পু আরাই এ দেশে আসেন এবং অবনীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে ভারত-শিল্পের চর্চা করেন। টাইকান-প্রমুখ শিল্পীদের মতো কম্পু আরাই ছিলেন ওকাকুরা-প্রতিষ্ঠিত শিল্পসভার অন্তর্ভুক্ত।

কম্পু আরাই-এর কাছে নন্দলাল হাতে-কলমে কালি-তুলির কাজ অভ্যাস করেন। কালি-তুলির কাজের প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় তুলির ব্যবহার। জাপানি পদ্ধতিতে তুলি টানার শিক্ষা করতে হলে হাতের দক্ষতা অর্জনের সঙ্গে আকার সম্বন্ধে সরল ও সংক্ষিপ্ত ধারণা করে নেওয়ার শিক্ষারও প্রয়োজন হয়। বলা বাহুল্য যে কম্পু আরাই-এর আঙ্গিকগত দক্ষতা ছিল যথেষ্ট। কম্পু আরাই-এর প্রভাবেই সম্ভবত গগনেন্দ্রনাথ কালি-তুলির কাজ শুরু করেন। করণ-কৌশলের মারপ্যাচ নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ কখনো মাথা ঘামান নি। এই নূতন পরিবেশেও অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন অনেক পরিমাণে উদাসীন। জাপানি শিল্পের এই আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য নন্দলাল ও গগনেন্দ্রনাথের সূত্রে আধুনিক শিল্পে আত্মপ্রকাশ করে। তবে নন্দলালের হাতে এই নূতন প্রভাব নন্দলাল-প্রবর্তিত শিক্ষানীতিকেও অনেক পরিমাণে চালিত করেছিল। এ বিষয়ে যথাস্থানে উল্লেখ করা হবে।

রবীন্দ্রনাথ ও জাপান

জাপান-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের শিল্পদৃষ্টিকে নূতন পথে চালিত করেছিল। তাঁর মনের তৎকালীন অবস্থা ও শিল্প সম্বন্ধে নূতন উপলব্ধি জাপান-যাত্রী গ্রন্থে যেমন ভাবে তিনি প্রকাশ করেছিলেন অনুরূপ ভাবে শিল্প সম্বন্ধে কোনো কথাই রবীন্দ্রনাথের পূর্বের রচনাতে পাওয়া যাবে না। রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল জাপানের কাছ থেকে তৎকালীন ভারতীয় শিল্পীরা অনেক কিছু শিখতে পারবেন। তাই তিনি অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথকে ঘর ছেড়ে একবার বেরিয়ে আসতে উপদেশ দেন। জাপানের শিল্পসংস্কৃতিকে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন কবির মন দিয়ে। সেই কবিসুলভ শিল্পদৃষ্টি অনুসরণ করে রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রভাবান্বিত সমাজ জাপানি শিল্প সম্বন্ধে নূতন করে ভাবতে শুরু করেন। অপর দিকে অবনীন্দ্রগোষ্ঠীর শিল্পীরা জাপানি শিল্পের অনুকরণ করার পথে নূতন করে সমর্থন পেলেন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে।

বিভিন্ন পথে জাপানি প্রভাবের আলোচনার পরেও এ প্রশ্ন জাগতে পারে যে কেন ভারতীয় পরম্পরার পরিবর্তে জাপানি শিল্পের সংস্কৃতি আমাদের অভিভূত করেছিল। অবনীন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় শিল্পের দ্বারা কোনোদিনই গভীর ভাবে আকৃষ্ট হন নি। ভারতের ধাতুমূর্তি মোগল ও রাজপুত -চিত্র এবং কোনারকের শিল্পসৃষ্টি অবশ্যই অবনীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল। সাধারণভাবে ভারতীয় মূর্তি ও অজন্তার ভিত্তিচিত্রকে অবনীন্দ্রনাথ আতিশয্য বা অতিশয়োক্তি বলে মনে করেছিলেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মত অবনীন্দ্রনাথের মত থেকে পৃথক ছিল না। ভারতীয় মূর্তিতে গীতধর্মী ভাবের অভাব উভয়কেই পীড়িত করেছে। জাপানি চিত্রের সংক্ষিপ্ত প্রকাশ-ভঙ্গি চিত্রপটের শূন্য অংশের (space) মর্যাদা বিশেষ ভাবে রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল। অনুরূপ ভাবেই অবনীন্দ্রনাথ জাপানি শিল্প থেকে শূন্য অংশকে মর্যাদা দেবার শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

অপর দিকে ভারতশিল্পের প্রধান অবদান আকারনিষ্ঠ নির্মাণধর্মী গুণ। যে-কোনো কারণেই হোক এই গুণের প্রভাব মার্জিত সমাজ থেকে তখন প্রায়

মুছে গিয়েছে। সাহিত্যে এই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠবার চেষ্টা চলেছিল সবুজ পত্রের যুগে রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর নেতৃত্বে। দৈবক্রমে অনুরূপ চেতনা শিল্পীসমাজে তখনো আত্মপ্রকাশ করে নি।

ভারতীয় শিল্পের জাগরণ, ভাবের জগতে অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষা, কারিগরি মনোভাব জাগাতে চায় নি। এই কারণে ভারতীয় কারিগরদের থেকে নব্যকালের শিল্পীরা ছিলেন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। যদিও এই ব্যবধান দূর করাই ছিল ই. বি. হ্যাভেলের সর্বপ্রধান লক্ষ্য। দৈবক্রমে অবনীন্দ্রনাথের অনুবর্তীদের অধিকাংশই কারিগরি শিক্ষাকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেছিলেন। এই কারণে ভারতীয় শিল্পের নির্মাণ-রীতি যেমন তাঁরা আয়ত্ত করেন নি তেমনি জাপানি শিল্পের গভীর তাৎপর্য উপলব্ধি করার পরিবর্তে বিষয়াশ্রিত বাহ্যিক সৌষ্ঠবকে তাঁরা অনুসরণ বা অনুকরণ করেছিলেন।

ইংরাজি-শিক্ষিত শহুরে ভারতবাসীর সঙ্গে লেখাপড়ায় অনভিজ্ঞ সমাজের যোগ অত্যন্ত ক্ষীণ। চিত্রকলার বাইরে শিল্পরূপের অন্য কোনো দিক অনুসন্ধানের প্রয়াস সে সময় দেখা দেয় নি। শিল্পের অন্তরে প্রবেশ করবার সম্ভাবনা, শিল্পসৃষ্টির ইচ্ছা ও জাতীয় জীবনের সঙ্গে শিল্পের সম্বন্ধ বুদ্ধি-বিচারের ক্ষেত্রে উপলব্ধি করেছেন তখন ভারতবাসী। শিল্পীসমাজ ভালোভাবেই বুঝেছেন যে বস্তুরূপের যথাযথ অনুকরণের সঙ্গে শিল্পসৃষ্টির কোনো সম্বন্ধ নেই। অনেকগুলি তাৎপর্যপূর্ণ উপলব্ধি সত্ত্বেও শিল্পরূপকে আকার বর্ণ রেখায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যে অভ্যাস ও অনুশীলন দরকার সে দিকে অধিকাংশ শিল্পীরাই ছিলেন উদাসীন। এই সময় অধিকাংশ শিল্পী উপজীবিকারূপে শিল্পচর্চা করেছিলেন বলেই অবনীন্দ্র-পরম্পরা অন্তর্ভুক্ত শিল্পীদের সামনে আর্থিক সমস্যা প্রধান হয়ে দেখা দেয় নি। যে মুষ্টিমেয় শিল্পীর পক্ষে শিল্পই ছিল একমাত্র জীবিকা তাঁরা সকল সময়ই পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের কাছ থেকে। অপর দিকে সোসাইটির সভ্যবৃন্দ ছিলেন এই-সব শিল্পীদের রক্ষাকবচ-স্বরূপ। বাৎসরিক প্রদর্শনীতে ছবি ক্রয় করা এবং উপযুক্ত ক্রেতার সন্ধান করার পথে সকল সময় নূতন শিল্পীগোষ্ঠী

সাহায্য পেয়েছিলেন সোসাইটির সভ্যদের কাছ থেকে। এই নবজাগ্রত শিল্পীগোষ্ঠীকে রক্ষা এবং জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টার পরিণামে নূতন শিল্পীদের মধ্যে অস্বাভাবিক আভিজাত্যের প্রভাব দেখা দিয়েছিল। আভিজাত্যসুলভ মনোভাবের অন্তরালে ছিল বিশেষ ভাবে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির প্রভাব।[১] এই কারণে অভিজাত সম্প্রদায়ের বাইরে সাধারণ সমাজের দাবি মেটানোর প্রয়োজন তৎকালীন শিল্পীরা বোধ করেন নি।

শিল্পশিক্ষা দীর্ঘকাল কোনো নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে তাঁর যোগ না হওয়া পর্যন্ত শিল্পী বা শিল্পধারা শক্তি অর্জন করতে সক্ষম হয় না। অবনীন্দ্রনাথ শিল্পীদের সকল দিক দিয়ে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন। সেই সঙ্গে ছিল সোসাইটির পৃষ্ঠপোষকতা। এই শিল্পী-গোষ্ঠীকে ভারতের সর্বত্র জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। এই কারণে খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে এই-সব শিল্পীদের কোনো বাধা হয় নি। এই ভাবে সমকালীন সমাজের দিকে না তাকিয়ে ভাবগত সৌন্দর্য আহরণের চেষ্টায় সাহিত্যের আওতায় এসে পড়েছিলেন

১ ঠাকুরবাড়ির আভিজাত্যের কেন্দ্রবিন্দু ছিল দক্ষিণের বারান্দা। তার সহজ একটা পরিচয় আমরা পেতে পারি। 'আরো হাল আমলে যখন আমরা আর্টিস্ট হয়ে উঠেছি, আর্ট সোসাইটির মেম্বর হয়েছি, বড়ো বড়ো সাহেবসুবো জজ ম্যাজিস্ট্রেট লাট আসেন বাড়িতে—কমলালেবুর শরবত, পান-তামাক, বেল ফুলে ভরে যায় সেই দক্ষিণের বারান্দা। বারান্দার পাশের বড়ো স্টুডিয়োতেই বীনকারের বীণা গভীর রাত্রে থেমে যায় সবাইকে স্তব্ধ করে দিয়ে।...

অবারিত দ্বার দক্ষিণের বারান্দায়, সবাই আসছে, বসছে, ছবি আঁকছি, গান চলছে, গল্পও হচ্ছে...।

বারান্দা যেন একটা জীবন্ত মিউজিয়াম। নানা চরিত্রের মানুষ দেখতে রাস্তায় বেরতে হত না, তারা আপনিই উঠে আসত সেখানে।'

জোড়াসাঁকোর ধারে, অবনীন্দ্রনাথ, রানী চন্দ, পৃ. ৬৬। 'দক্ষিণের বারান্দা' সম্বন্ধে বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যাবে আরো দু-একটি গ্রন্থে। দ্র. শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনী ও মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দক্ষিণের বারান্দা'।

এই-সব শিল্পীরা। অবশ্য শিল্প বলতে যেমন অবনীন্দ্রনাথকে বোঝাত তেমনি সাহিত্য বলতে রবীন্দ্রনাথই ছিলেন একমাত্র আদর্শ। রবীন্দ্রসাহিত্য, ঠাকুর-পরিবারের আভিজাত্য একত্রিত হয়ে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পধারাকে বিপথগামী করল বিচিত্রা সভার কালে।[1]

লর্ড রোনাল্ডসে ও সোসাইটি

জাতীয় শিল্পের অন্যতম প্রকাশরূপে ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটি বিদগ্ধ সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটিকে সরকারি আওতায় নিয়ে এলেন তৎকালীন বাংলার গভর্নর লর্ড রোনাল্ডসে (১৯১৯)। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সোসাইটির শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যই হয়েছিল। সমবায় ম্যানসনের একটি বৃহৎ অংশে ছাত্রদের থাকবার ব্যবস্থা, প্রদর্শনী-গৃহ, অফিস-গৃহ, আসবাবপত্র -সমেত জাতীয় শিল্পশিক্ষার নূতন কেন্দ্র স্থাপিত হয় ১৯২০ সালে। সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত ছাত্রাবাসের নিয়মকানুন পাঠক্রম ইত্যাদি বিষয় সংক্রান্ত কোনো প্রসপেক্টস সেই সময় প্রকাশিত হয় নি। অন্যান্য স্কুলের মতো দশটা থেকে চারটে পর্যন্ত ছাত্ররা ছবি আঁকা শিখতেন। ছাত্রাবাসে না থেকেও যে-কেউ এই ক্লাসে যোগ দিতে পারতেন।

সোসাইটি স্থাপনের অল্পদিন পরে উড়িষ্যার পরম্পরাগত কারিগর গিরিধারী

১ আর একটু পরিষ্কার করে বলা যেতে পারে, সে সময় "ঠাকুরবাড়ি'র আসরের চিত্রীরা সমকালীন সাহিত্যিকদের সঙ্গে যতখানি অভিন্নাত্মা ছিলেন, শিল্প ও সাহিত্যের পরস্পর-নির্ভর সম্পর্ক ও প্রভাব নিয়ে তাঁরা যেরকম সচেতন ছিলেন, ঠাকুরবাড়ি ও দক্ষিণের বারান্দার চৌহদ্দির বাইরে যে শিল্পীসমাজ ও শিল্পধারা বেঁচেছিল তা নিয়ে কিন্তু এঁদের তাবৎ শিরঃপীড়া ছিল না। শিল্পকে এঁরা নিরঙ্কুশ কবির দৃষ্টি নিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন। শিল্পের পিছনে যে একটি কারিগরি দিক আছে, তার সঙ্গে 'বিশ্বকর্মার' সম্বন্ধটি যে ওতপ্রোত এ কথা বোধ হয় তাঁরা বিস্মৃতই হয়েছিলেন। তাই বিচিত্রা সভার কালে এখানে যে পরিবেশটি তৈরি হয়েছিল সেটিকে আর সর্বভারতীয় বা সার্বজনীন বলা যায় না; সেটি ঠাকুরবংশীয় ও ঠাকুরবাড়ির পৃষ্ঠপোষিত একটি সীমিত শিল্পমণ্ডলের রূপ নিয়ে ক্ষয়িষ্ণু পরিচয় বহন করেছে মাত্র।

মহাপাত্র নিযুক্ত হন। গিরিধারী মহাপাত্র মূর্তিশিল্পে দক্ষ ছিলেন। তাঁর কাছে সে সময় কোনো শিল্পী পাথর-কাটার কাজ শেখেন নি। তিনি নিজেই কাজ করেছেন, অবশ্য অবনীন্দ্রনাথ কিছু পাথর-কাটার কাজ করেছিলেন। তবে এই-সব কাজ পরম্পরার পথ ধরে রচিত হয় নি। গিরিধারী মহাপাত্র ও নব্যকালের শিল্পীদের মধ্যে গুরুশিষ্য সম্বন্ধ কোনোদিনই গড়ে ওঠে নি। একাসনে বসার সৌভাগ্য এই কারিগরের ভাগ্যে কোনোদিনই ঘটে নি।

সোসাইটির উল্লেখযোগ্য কাজ 'রূপম' পত্রিকা[১] এবং বাৎসরিক প্রদর্শনী। এখন অখিল ভারত প্রদর্শনী দেখে যাঁরা অভ্যস্ত, তাঁদের কাছে তৎকালীন সোসাইটির বাৎসরিক প্রদর্শনীর কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া গেল। প্রদর্শনীর জন্য ছবি বাছাই করতেন প্রধানত অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ। উদীয়মান শিল্পীদের সম্বন্ধে সকলেই সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। ভাবপূর্ণ নামকরণের সাহায্যে প্রদর্শনীর চিত্রগুলিকে হৃদয়গ্রাহী করে তোলার দিকে প্রায়ই শিল্পীরা লক্ষ্য দিতেন। অবনীন্দ্রনাথের কাছ থেকে ছবির নামকরণ করিয়ে নিতে পারলে শিল্পীমাত্রই খুশি হতেন। বলা বাহুল্য চিত্রিত আকার-প্রকারের সঙ্গে নামকরণের অনেক সময় প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ থাকত না। দেয়ালে ছবি সাজাবার সময় বর্ণে, ভাবে, রেখায় এক ছবির সঙ্গে অন্য ছবির সংঘাত না ঘটে—এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া হত।

সে সময় সোসাইটির প্রদর্শনী ছিল একটি শিক্ষার স্থান। এই প্রদর্শনীতে দর্শকের সংখ্যা কম বেশি যেমনই হোক সকলেই নিবিষ্ট মনে ছবি দেখতেন। জিজ্ঞাসু দর্শক শিল্পসংক্রান্ত ব্যাপারে অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ করারও সুযোগ পেতেন। ভারত-শিল্পের যে নূতন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হল তা পরিচালনা করার দিকে কেউ দৃষ্টি দেন নি। তাঁরা পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম ছিলেন, কিন্তু প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার দিকে দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন অবনীন্দ্রনাথ কোনোদিন বোধ করেন নি। কারণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা

১ শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় -সম্পাদিত।

অবনীন্দ্রনাথ বা গগনেন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। যে ভাবে আর্টস্কুলে, দক্ষিণের বারান্দায় ও বিচিত্রা সভায় শিল্পের পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছিল অনুরূপ ভাবে সোসাইটি পরিচালিত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠান স্থায়ী করার পরিবর্তে অবনীন্দ্রনাথ 'কারুছত্র' নাম দিয়ে একটি সভার পরিকল্পনা শিল্পীসমাজে উপস্থিত করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন "নানা কাব্যকলা, শিল্পকলা, নৃত্যনাট্য এমনি সব নানা বিদ্যা ছত্রভঙ্গ হয়ে না থেকে সংগীতের বিচিত্র সুরের মতো যদি একতানে বাজতে থাকে তবেই এই কারুছত্রটি দেশ-বিদেশের কলাবিদগণের ও রসিকদের হাতে একটি অপূর্ব একতার স্বরূপ হয়ে সার্থকতা লাভ করবে।"

তিনি আরো লিখেছেন, "আমার নিজের ছবির মতো কারুছত্রটাও আমার কল্পনাপ্রসূত কিংবা আমার স্বার্থের সঙ্গে জড়ানো বলে তোমরা ভুল কোরো না। এটা কোনো দল-বিশেষের কেল্লাও নয়।"

কারুছত্রের উদ্‌যোগে 'অয়ন' পত্রিকা প্রকাশিত হয় বীরেশ্বর সেনের সম্পাদনায়। দৈবক্রমে কারুছত্রের আদর্শ অধিক দূর অগ্রসর হতে পারে নি। কারুছত্র ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে বিলম্ব হল না। অপর দিকে সোসাইটি দলগত কেল্লায় পরিণত হল অতি অল্পকালের মধ্যে। এই দুর্ঘটনার কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে।

ধীরে ধীরে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির অন্তর্ভুক্ত তরুণ শিল্পীরা এই সোসাইটির উপর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেন। ক্রমে সোসাইটি-গৃহ সন্ধ্যার পর বৈঠকখানা বাড়িতে পরিণত হয়। নানা বিশৃঙ্খলতার মধ্যে শিক্ষাকেন্দ্র-রূপে সোসাইটির অবসান ঘটে ১৯২৯ সালের মধ্যে।

৩

ক্ষিতীন্দ্রনাথ, সোসাইটির শিক্ষা ও কলাভবন

এই নূতন শিক্ষাকেন্দ্রের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের নাম যুক্ত থাকলেও শিক্ষা পরিচালনার ভার ন্যস্ত হয়েছিল নন্দলাল ও ক্ষিতীন্দ্রনাথের উপর। অল্পকালের মধ্যে নন্দলাল সোসাইটি ত্যাগ করেন। শিক্ষকতার কাজ পুরোপুরি গ্রহণ করেন ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার। সোসাইটি পরিচালনা সম্বন্ধে ক্ষিতীন্দ্রনাথের দায়িত্ব ছিল না, কাজেই এই বিশৃঙ্খলতার জন্য শিক্ষক ক্ষিতীন্দ্রনাথকে দায়ী করা চলে না। এ ক্ষেত্রে তাঁর শিক্ষা-পদ্ধতি আমাদের আলোচনার বিষয়। অবনীন্দ্রনাথের অন্যান্য অনুবর্তীদের মতো ক্ষিতীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথের কাছে যে শিল্পের দীক্ষা নিয়েছিলেন সেটিকে তিনি অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন এবং জীবন দিয়ে লালন করেছিলেন।

ক্ষিতীন্দ্রনাথ প্রাচীন বা নবীনের কোনো পদ্ধতির হুবহু অনুকরণ করার প্রয়াস করেন নি। প্রত্যক্ষ উপলব্ধির পথে ধারণাত্মক রূপ তিনি সৃষ্টি করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। ভারত-শিল্পের আধ্যাত্মিকতা সে সময় অনেকের কাছেই ছিল বুদ্ধিগ্রাহ্য। ক্ষিতীন্দ্রনাথের কাছে আধ্যাত্মিকতা প্রত্যক্ষ ও হৃদয়গ্রাহ্য। এই মনোভাব নিয়ে তিনি ছাত্রদের প্রেরণা দিতে পেরেছিলেন, শিক্ষার বিধিব্যবস্থা প্রণয়নের চেষ্টা করেন নি। অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষার আদর্শ যথাযথ অনুসরণ ছিল তাঁর লক্ষ্য। এই সময় অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষা যে পথে চলেছিল তার কিঞ্চিৎ বিবরণ এখানে দেওয়া গেল। ভাব ও কল্পনা -আশ্রিত রূপনির্মাণ, অবনীন্দ্রনাথের অনুসরণে বর্ণলেপন, মোগল শৈলীর রেখা, রাজপুত বা অজন্তা চিত্রের সাজসজ্জা-অলংকরণ— এ বিষয়গুলির শিক্ষার সঙ্গে ছিল অবনীন্দ্রনাথ-রচিত ষড়ঙ্গ পুস্তকের প্রভাব। সাদৃশ্য ও ভাবলাবণ্য বিশেষভাবে এই দুইটি বিষয়ে শিল্পীরা তখন সচেতন ছিলেন।

অন্যান্য অবনীন্দ্র-অনুগামীদের মতো ক্ষিতীন্দ্রনাথও এই সংস্কারটি অনুসরণ করেছিলেন। অবনীন্দ্র-প্রবর্তিত বর্ণলেপন রীতি (wash) এই সংস্কারের

সর্বপ্রধান অঙ্গ ছিল। পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ ও শিক্ষিত অবনীন্দ্রনাথ ছবিতে 'ওয়াশ' দিয়েছেন বর্ণের আলোছায়ার বিচিত্র কারুকার্য প্রবর্তনের জন্য। অপর দিকে মোগল-চিত্রের বর্তনাযুক্ত রেখা তিনি অনুশীলনের পথে আয়ত্ত করেন এবং ভাবলাবণ্যের প্রতীকরূপে রেখার প্রয়োগ তিনি করেন। বিভিন্ন পরম্পরা থেকে বিচিত্র উপাদান তিনি নিজের মতি-মেজাজ অনুযায়ী প্রবর্তন করেছেন চিত্ররচনার কালে। বাস্তব উদ্দীপনার অভিজ্ঞতা তাঁর চিত্রের যত্রতত্র আমরা লক্ষ্য করি। পূর্বেই বলেছি রূপ-নির্মাণের ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথের নির্দেশ অল্পই। তিনি বিশেষভাবে বর্ণের জগতে শিল্পীদের চালিত করার চেষ্টা করেন। এই কারণে অবনীন্দ্র-পরম্পরার শিল্পীরা আচার্যের বর্ণপ্রয়োগ-রীতি অনুসরণের চেষ্টা করেছিলেন। বিষয়-অনুযায়ী বর্ণলেপন, ক্রমে সমস্ত কাগজের উপর রঙের আচ্ছাদন, জলে ভিজিয়ে রং পাকা করা এবং রেখা ও বর্তনার প্রবর্তন, প্রয়োজনমত বর্ণের আচ্ছাদনের অংশবিশেষ (highlight) মুছে নেওয়া, এই প্রকরণের পুনরাবৃত্তির পথে অবনীন্দ্রনাথের ছবি পূর্ণতা পেয়েছে।

অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কন-প্রণালী যাঁরা লক্ষ্য করার সুযোগ পেয়েছেন তাঁদের অনেকেরই ধারণা হত যে তিনি অনিশ্চিত ভাবে কোনো অজ্ঞাত পথে এগিয়ে চলেছেন, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যেন তাঁর কোনো নিশ্চয় ধারণা নেই। এই অনুমান আংশিক সত্য হলেও অভ্রান্ত নয়। 'ওয়াশ'-প্রয়োগের কালে অবনীন্দ্রনাথ প্রয়াস করতেন আলোর বৈচিত্র্য আনতে, যথা— ভোরের আলো, সন্ধ্যার আলো, প্রদীপের আলো, আলো অন্ধকারে মিশে যাওয়া আলো ইত্যাদি। এই লক্ষ্য অনুসরণের কালে দেশী বিলাতি জাপানি পরম্পরাগত উপাদান তিনি প্রয়োগ করেছেন। ভারতীয় শিল্পের কৌলীন্য রক্ষা করার প্রয়াস তিনি করেন নি। দৈবক্রমে তাঁর এই সমন্বয়ধর্মী অঙ্কনরীতি শুধু ভারতীয় পরম্পরা অন্তর্ভুক্ত বলে যাঁরা মনে করেছিলেন সেইসব শিল্পীরাই অবনীন্দ্রনাথের স্টাইলকে রীতিতে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেন। নন্দলাল বলেছেন, "আমরা কেউই অবনীন্দ্র-নাথের মতো ওয়াশ দিতে পারি নি।" এই উক্তির সমর্থন তাঁর অনেক সতীর্থদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না। বিশেষভাবে সোসাইটির শিল্পীরা অবনীন্দ্রনাথের

ওয়াশটিকে ভারত-শিল্পের একমাত্র প্রকাশ বলে মেনে নিয়েছিলেন। ক্রমে অবনীন্দ্র-প্রবর্তিত জটিল বর্ণপ্রয়োগ-রীতি বৈচিত্র্যহীন ঘোলাটে বর্ণলেপনে রূপান্তরিত হয়। সেই সঙ্গে তা অলংকারবহুল হয়ে পড়ে ও সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর এবং বৈচিত্র্যহীন রেখাপ্রয়োগ ভাবলাবণ্যের স্থান অধিকার করে।

"সৌন্দর্য অন্তরের বস্তু" অবনীন্দ্রনাথের এই মহৎ উক্তি রূপান্তরিত হয়ে সাহিত্যগত বর্ণনায় পর্যবসিত হয়।

বৈচিত্র্য প্রবর্তনের জন্য যে বস্তুসম্ভার বাড়িয়ে তুলতে হয় না সে কথা ক্ষিতীন্দ্রনাথের রচনা থেকে শিল্পীরা শিক্ষা করেন নি। সোসাইটি প্রতিষ্ঠার প্রাক্‌কালে অবনীন্দ্রনাথের চিত্রে রেখা, বর্ণ, আকারের অতুলনীয় ঐশ্বর্য সোসাইটির শিল্পীদের আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয় নি এবং অবনীন্দ্রনাথের সমকালীন রচনা থেকে কিছু গ্রহণের চেষ্টাও তাঁরা করেন নি।

বাস্তবতা ভারতশিল্পের আদর্শ নয়; অতএব কোনোভাবে বাস্তব উদ্দীপনা গ্রহণের প্রয়োজন নেই, এই অতি বিপজ্জনক ধারণাটি তখন শিল্পীসমাজে বদ্ধমূল। অবনীন্দ্রনাথের চিত্রের বস্তুনিষ্ঠ গুণ, ক্ষিতীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি-সুলভ চিত্রিত আকার-প্রকার, নন্দলালের চিত্র-নির্মাণরীতি কোনো কিছুই সোসাইটির শিল্পীদের সচেতন করতে সক্ষম হয় নি।

ফরাসী-মার্কা জাপানি চিত্র এবং বিলাতি ওয়াটার কালার ইত্যাদি অনুকরণের চিহ্ন থেকে আরো স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে তৎকালীন শিল্পীদের মনের নির্জীবতা। শিল্পের অবস্থা যতই নির্জীব হোক-না কেন অবনীন্দ্র-পরম্পরার জনপ্রিয়তা সে সময় প্রচুর। তাই দেখা যায় আর্টস্কুলের বিলাতি পদ্ধতিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেকে অবনীন্দ্রনাথের পথ অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন। শিল্পের এই দুরবস্থা সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ যে সচেতন ছিলেন না এমন নয়। জনৈক চিত্ররসিক যখন অবনীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করেন যে সকলেই আপনার মতো ছবি আঁকছে কেন? অবনীন্দ্রনাথ জবাবে বলেন, 'কেউ যদি আমার উচ্ছিষ্ট ভোজনে খুশি হয় সেজন্য আমি দায়ী নই।' সত্যই অবনীন্দ্রনাথ অতীত বা বর্তমান কোনো দিক দিয়েই 'উচ্ছিষ্ট গ্রহণে' কাউকে উৎসাহিত

করেন নি বরং এ বিষয়ে তাঁর বিপরীত মতের সাক্ষ্য বহু স্থানে পাওয়া যাবে।

ব্যর্থ অনুকারকদের হাতে অবনীন্দ্র-প্রবর্তিত শিল্পধারার এক অংশ নির্জীব হয়ে এলেও তাঁর উজ্জ্বল শিক্ষানীতি ভারতীয় শিল্পকে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল।

শিল্পের জাগরণ কোনোদিনই আঙ্গিক চর্চার পথে ঘটে নি। নূতন চেতনা, নূতন উপলব্ধি, নূতন উদ্দীপনা সকল সময় শিল্পকলার গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করেছে। তার পরে এসেছে আঙ্গিকের অনুশীলন। অবনীন্দ্রনাথ আঙ্গিকের অনুশীলন নিয়ে ছাত্রদের ব্যস্ত করেন নি বলে তাঁর শিক্ষা খেয়ালের সৃষ্টি, এ কথা বলা চলে না। শিল্পশিক্ষার নীতি ও বর্তমান অবস্থা-ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত থেকে বিনা তর্কে এই মীমাংসা আমরা করতে পারি যে আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে অবনীন্দ্রনাথ অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর অবদান শিল্পশিক্ষার ইতিহাসে অমূল্য সম্পদ। উপকরণ-আশ্রিত যান্ত্রিক শিক্ষা অবনীন্দ্রনাথ যত অল্প সময়ে দূর করতে পেরেছিলেন তার তুলনা শিল্পশিক্ষার ইতিহাসে বিরল।

রবীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল : কলাভবন

অবনীন্দ্র-পরম্পরা অঙ্কুরিত হবার মুহূর্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ এই নবজাগ্রত শিল্পধারা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। কারণ একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত অবনীন্দ্রনাথকে তিনি শৈশব থেকেই দেখেছেন এবং তাঁর মতি-মেজাজ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন যে অবনীন্দ্রনাথ বা গগনেন্দ্রনাথ পরিচালনার দায়িত্ব সম্বন্ধে উদাসীন। তিনি অনুভব করেছিলেন যে ভারত-শিল্প জীবনের বৃহত্তর পটভূমি থেকে ক্রমে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসছে। শহরের আওতায় এই শিল্পধারার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। সরকারের পৃষ্ঠ-পোষকতায় সোসাইটির নবপর্যায় শুরু হবার মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ আর-একবার অবনীন্দ্রনাথকে তাঁর প্রবর্তিত শিল্পধারার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সচেতন করার চেষ্টা

করলেন। তিনি জানালেন যে ভারত-শিল্প নূতন পরিবেশে নূতন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। কেবলমাত্র সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে শিল্পীদের আর্থিক লাভ হতে পারে কিন্তু শিল্পধারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[১] যে সময় রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে ভারত-শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পত্রবিনিময় চলেছিল সেই সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ক্ষুদ্র পরিধিকে বিস্তৃত করে আন্তঃপ্রাদেশিক অথবা আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্রে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করছিলেন।

সেই প্রচেষ্টার সহজ পরিচয় রয়েছে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আবাসিক বিদ্যালয়ে। আবার তৎকালীন আবাসিক বিদ্যালয়ের (Residential School) পরিবেশ সম্বন্ধে সম্যক জানতে হলে ছাত্রছাত্রীদের ছাত্রাবাসের (dormitory) জীবন সম্বন্ধেও জানবার প্রয়োজন হয়। এ সময় ছাত্রাবাসের সংখ্যা ছিল কম। তাই বিশ্বভারতীর সমস্ত বিভাগের ছাত্রদের মিলে মিশে থাকা ছাড়া উপায় ছিল না। একই ঘরে হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মণ ও তথাকথিত অস্পৃশ্য-হরিজন সকলেই একই সঙ্গে, এক পরিবারভুক্তের মতো থেকেছেন।

ফলে বিভিন্ন বিভাগের ছাত্ররা কে কী করছেন, কে কী ভাবছেন, কার প্রতিক্রিয়া কিরকম সকলেই সমস্ত কিছু জানতে পারতেন। যাঁরা ভাষা সাহিত্য কিংবা দর্শন শিক্ষা করছিলেন তাঁদের কথা যেমন কলাভবনের ছাত্রদের অগোচর ছিল না তেমনি কলা-সংগীতের ছাত্রদের চিন্তাধারা, কর্মপদ্ধতি ও স্বাতন্ত্র্যবোধ সম্বন্ধে অন্য বিভাগের ছাত্ররাও যথেষ্ট অবস্থিত ছিলেন। পারস্পরিক এই অবগতি পারস্পরিক আলাপ-আলোচনায় পরিণতি পেয়েছে এবং তার সুযোগও ছিল যথেষ্ট।

পরস্পরের ভাবনাচিন্তা-কর্মধারার প্রতি পরস্পরের সম্মান সহানুভূতি ও সহযোগিতার মনোভাব গড়ে ওঠার ফলে বিশ্বভারতীর প্রথম যুগের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সংস্কৃতি সম্বন্ধে এমন একটি সার্বজনীন চেতনা দেখা দিয়েছিল

১ পরিশিষ্ট ১ : দ্রষ্টব্য।

যেটিকে সহজ কথায় দুর্লভই বলা চলে। পরস্পর-বাসে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অবকাশ থেকেই এই সাংস্কৃতিক মনোভাবের জন্ম হয়েছিল। আলোচনা-সভা, বক্তৃতা ও নানা গ্রন্থের সহায়তায় এই সংস্কৃতি-রুচি গড়ে ওঠে নি। কাজেই রবীন্দ্রনাথ যে একজন সর্বভারতীয় ব্যক্তিত্ব এ কথাটি নিতান্ত সহজে স্বাভাবিক স্বীকৃতি পেয়েছিল। এটি আমরা দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করছি।

নন্দলালকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসার ইচ্ছা থেকেই অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পত্রবিনিময় শুরু হয়। নন্দলালকে তাঁর বিশেষ প্রয়োজন ছিল, কারণ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার প্রাক্‌কালে তিনি বলেছেন— "আমার বিশ্বভারতীর দুটি প্রধান অঙ্গ হবে শিল্প ও সংগীত।" বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাকালে রবীন্দ্র-নাথের মনে শিল্প ও সংগীত এই দুটি বিষয়কে প্রধান করে দেখবার কারণ অনুসন্ধান করা যেতে পারে।[১] কলা ও সংগীতকে শিক্ষার প্রধান বাহনরূপে রবীন্দ্রনাথ কেন দেখেছিলেন সে বিষয়ে স্বতন্ত্র আলোচনার সাহায্য না নিয়ে কিভাবে এই বিষয়গুলিকে তিনি শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন সেইটিই পরবর্তী আলোচনার প্রধান লক্ষ্য। অর্থাৎ শিল্পকলার ক্ষেত্রে শিক্ষকরূপে রবীন্দ্রনাথ যা করেছেন সেই সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করব।

রবীন্দ্রনাথ কেতাবি বিদ্যাকে সর্বপ্রধান বলে কোনোদিনই স্বীকার করেন নি। মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ তাঁর শিক্ষার লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অনুসরণ করেই ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। শিল্প, সাহিত্য, উৎসব ইত্যাদি শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গরূপে স্বীকার করা এবং সেই স্বীকৃতিকে সক্রিয় করে তোলার পথেই রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত শিক্ষাদর্শের সার্থকতা। সহশিক্ষা প্রবর্তনের পথিকৃৎ-রূপে শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথের নাম স্মরণীয়। সহশিক্ষার সম্বন্ধে নানা সমস্যার কথা আজকে আর হয়তো ভাবতে হয় না। রবীন্দ্রনাথও আইন-কানুন, বিধি-নিষেধ দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথক রাখার কোনো কৃত্রিম চেষ্টা করেন নি সেটুকুই তাঁর

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ 'কলা-বিদ্যা', শান্তিনিকেতন পত্রিকা।

প্রবর্তিত সহশিক্ষার বৈশিষ্ট্য। সহশিক্ষাকে স্বাভাবিক গতি দেবার জন্য তিনি যৌনবিজ্ঞান নিয়ে নানা আলোচনা-সভার আয়োজন করেছেন। বিশেষজ্ঞ কেউ না থাকায় তিনি স্বয়ং হ্যাভলক-এলিস আদি মনোবিজ্ঞানীদের লেখা নিয়ে সহজ আলোচনা করেছেন। তাঁর রচিত তৎকালীন কিছু গান, অভিনয়, নৃত্য ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তিনি ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্ককে সহজ গতি দিয়েছেন। এই নূতন ব্যবস্থা ছাত্রছাত্রীর জীবনে অজ্ঞাতেই সহজ স্বাভাবিক হয়ে দেখা (assimilated) দিয়েছে।

স্ত্রীপুরুষের সহজ সম্পর্কের মধ্যে যেমন স্বাভাবিক উপভোগ বাসনাও (gratification) আছে সেটিকে নিয়ন্ত্রিত করতে কোনো আইনের সহায়তা তিনি নেন নি। সেজন্যই তা স্বাভাবিক পথ ধরে অগ্রসর হয়েছে।

সহশিক্ষার প্রথম প্রবর্তন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তার এমন সহজ স্বাভাবিক সমাধান শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথের অদ্ভুত দূরদৃষ্টিরই পরিচয় দেয়। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে হাতে-কলমে শিক্ষাব্রতী রূপে রবীন্দ্রনাথ যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তারই পরবর্তী বিকাশ তাঁর পরিকল্পিত বিশ্বভারতী।

সুযোগ-সুবিধামত রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচর্যাশ্রমে কলাবিদ্যা শিক্ষার সুযোগ অনুসন্ধান করেছিলেন। অপর দিকে সংগীতচর্চার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে রবীন্দ্রনাথকে অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হয় নি। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের রুটিন-মাফিক শিক্ষার সঙ্গে আর-একটি শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল সেটি রবীন্দ্রনাথ-প্রদত্ত মন্দিরের সাপ্তাহিক উপদেশ। শান্তিনিকেতন গ্রন্থে সংকলিত এই উপদেশগুলি আলোচনা করলে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার মূলসূত্রগুলি আমরা লক্ষ্য করতে পারি। উপনিষদের মন্ত্রগুলি অবলম্বন করে জীবনের নানা সমস্যা নিজের উপলব্ধির আলোতে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন তৎকালীন আশ্রমবাসীদের জন্য।

ভারতের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি, নৈতিক জীবন, অভ্যাসের পথে জীর্ণ সংস্কারের বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার উপায় যেমন তিনি উপস্থিত করেছিলেন তেমনি প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের প্রয়োজনীয়তা, এই বিষয়গুলি রবীন্দ্রনাথ বারংবার আলোচনা করেছেন। চোখ মেলে দেখা, কান পেতে

শোনার যে বিশেষ প্রয়োজন ধ্যানের জগতের মতোই, ইন্দ্রিয়জাত উপলব্ধির জগৎকেও যে জানতে হয়, চিনতে হয় এ কথা শিক্ষাব্রতীরূপে রবীন্দ্রনাথই আমাদের প্রথম জানিয়েছেন। "তুমি কি ভাবছ, চোখ বুজে ধ্যানযোগে দেখবার কথা আমি বলছি? আমি এই চর্মচক্ষে দেখবার কথাই বলছি। চর্মচক্ষুকে চর্মচক্ষু বলে গাল দিলে চলবে কেন? একে শারীরিক বলে তুমি ঘৃণা করবে এতবড়ো লোকটি তুমি কে? আমি বলছি, এই চোখ দিয়েই, এই চর্মচক্ষু দিয়েই এমন দেখা দেখবার আছে যা চরম দেখা।"[১]

"যদি এই মহাকাশের লীলাকেও আমরা কানের সিংহদ্বার দিয়ে অভ্যর্থনা করতে পারতুম তা হলে বিশ্ববীণার এই ঝংকারকে আমরা গান বলেও চিনতে পারতুম।"[২]

এই উপলব্ধিগত কারণেই ইন্দ্রিয়ধন্য সৌন্দর্য-সাধনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী ব্রহ্মচর্যাশ্রমেরই অন্যতম একটি শাখা। এই কারণে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের নামকরণ হয় পূর্ব বিভাগ, আর বিশ্বভারতীর নাম দেওয়া হল উত্তর বিভাগ। উত্তর বিভাগের শিক্ষার বিষয় ছিল ১. সাহিত্য-দর্শন, ২. কলা ও সংগীত, ৩. ছাপাখানা, বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং পূর্তকর্ম মিলে নামকরণ হল শিল্প-বিভাগ। এই অপরিণত পরিকল্পনার কালে নন্দলাল তাঁর ভ্রাতা সুরেন্দ্রনাথকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হন।

বিশ্বভারতীর এই অপরিণত অবস্থায় নন্দলাল ও তাঁর ভ্রাতা সুরেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে যোগ দেন শিল্পীরূপে। একটি চিত্র-প্রতিযোগিতার ঘোষণা থেকে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ছাত্ররা নন্দলালের উপস্থিতি প্রথম জানলেন। সম্ভবত ছাত্রদের মধ্যে সৃজনী শক্তির অনুসন্ধান ছিল এই প্রতিযোগিতার লক্ষ্য। প্রতি-যোগিতার বিষয় ছিল এইরূপ: ১. ইলেকট্রিক্ পোস্ট, ২. গোরু-মোষ, ৩. গাছ ও

১ 'দেখা', শান্তিনিকেতন, পৃ. ৫৫।

২ 'শোনা', তদেব, পৃ. ৫৮।

স্কুল।[১] ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অধিকাংশ ছাত্র এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিলেন। প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্তে উপস্থিত হবার পূর্বেই অকস্মাৎ নন্দলাল তাঁর তিনজন ছাত্র -সহ আশ্রম ত্যাগ করেন এবং পরে তাঁরা সোসাইটিতে যোগ দেন।

অসিতকুমার

নন্দলালের অনুপস্থিতিতে অসিতকুমার কলিকাতা আর্টস্কুলের কাজে ইস্তফা দিয়ে তিনজন ছাত্রকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হন ১৯১৯ সালে এবং নন্দলালের স্থান গ্রহণ করেন।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সঙ্গে অসিতকুমারের যোগ দীর্ঘকালের। তিনি প্রথম ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রদের চিত্রবিদ্যা শিখিয়েছিলেন এবং ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিল্পের পরিবেশ তাঁরই চেষ্টায় সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু স্থায়ীভাবে এই প্রথম তাঁর শান্তিনিকেতনে আগমন।

বিচিত্রা সভার আমলে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পধারা ও রবীন্দ্রসাহিত্য যখন প্রায় এক হয়ে এসেছে সেই সময়ের ভাবধারার উজ্জ্বল প্রকাশ শিল্পী অসিতকুমার। অসিতকুমার উপদেশের সাহায্যে ছাত্রদের শিখিয়েছেন। হাতে-কলমে দেখানো অথবা শিল্পচর্চার কোনো নির্দিষ্ট পথ দেখিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা তিনি বোধ করেন নি। কারণ তিনি নিজেও ছবি এঁকেছেন এই ভাবে। অবনীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত আঙ্গিককেই তিনি চূড়ান্ত বলে মনে করতেন। এই কারণে ছাত্রদের তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষা দেবার অনুকূল পরিবেশ তিনি শান্তিনিকেতনে পেয়েছিলেন।

বিশ্বভারতী তথা উত্তর বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন বিধুশেখর শাস্ত্রী। এই কারণে পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যাপারে অসিতকুমারের কোনো দায়িত্ব ছিল না। তৎকালীন আলোচনা-সভায় অসিতকুমার যে-সব প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন বা

১ প্রতিযোগীদের ছবিগুলি কলাভবন সংগ্রহে দ্রষ্টব্য।

সাধারণভাবে আলোচনা করেছিলেন তার থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে তিনি শিল্পীর স্বাধীনতা এবং শিল্পের ভাবরূপকেই প্রধান করে দেখেছেন। সমকালীন জীবন থেকে শিল্পের উপাদান গ্রহণ করাকে কল্পনাবর্জিত মনের প্রকাশ বলেই তিনি মনে করতেন। অসিতকুমারের এই মনোভাব অনুযায়ী বিধুশেখর শাস্ত্রী কলাভবনের রিপোর্টে লিখেছিলেন—"কলাভবনে কল্পনা ও চিত্রবিদ্যা শিখানো হইবে।" নূতন পরিবেশে অসিতকুমারের এই আদর্শ অনুসৃত হয় নি; এমন-কি অসিতকুমারের নিজের রচনাক্ষেত্রেও বাস্তব জীবনের ঘনিষ্ঠ প্রকাশ এই সময় প্রথম লক্ষ্য করা গেল। গ্রাম্যজীবনের রেখাচিত্র, কুণাল, রাইরাজা ইত্যাদি চিত্রকর্ম থেকে তাঁর এই মনোভাবটি ধরা পড়ে। বলা যেতে পারে কলাভবনের শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল তৎকালীন প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের দ্বারা।

যে সংকীর্ণ গৃহে কলাভবনের কাজ শুরু হয়েছিল সেখানে উপকরণের আতিশয্য ছিল না। বিচিত্রা সভার কালে সংগৃহীত লোকশিল্পের কিছু নিদর্শন, অল্পসংখ্যক বই, জাপানি চিত্রের কলো-টাইপ প্রিণ্ট— মোটামুটি এই ছিল কলাভবনের সংগ্রহালয়। সেই সঙ্গে দেয়ালে টাঙানো ছিল লেডি হেরিংহামের অনুকৃত অজন্তার কয়েকখানি ছবি। অসিতকুমার ও তাঁর শিষ্যবর্গ একই জায়গায় বসে কাজ করতেন। উপরতলায় কলাভবন, নীচের তলায় সংগীত-ভবন। ছবি, গান, আলাপ-আলোচনা, অসিতকুমারের স্বতঃস্ফূর্ত রহস্যপূর্ণ উক্তি, অপর দিকে মাঠে মাঠে স্কেচ্ খাতা হাতে যথেচ্ছ ভ্রমণ — এই ছিল কলাভবনের পরিবেশ। তখনও নন্দলালের সঙ্গে কলাভবনের সম্বন্ধ সম্পূর্ণ চুকে যায় নি। তিনি সপ্তাহে একবার কলাভবনে উপস্থিত হতেন। সারা সপ্তাহের কাজ ছাত্ররা তাঁর কাছে উপস্থিত করতেন। ছবির বাঁধন, ড্রইং ও বর্ণের ক্ষেত্রে কালো-সাদার পরিবেশ সৃষ্টি এইগুলি সম্বন্ধে নন্দলাল নির্দেশ দিতেন। সকল সময় অসিতকুমারকে বলতেন সংশোধনের কারণগুলি ছাত্রদের বুঝিয়ে দিতে। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে তিনি ছাত্রদের সচেতন থাকতে বলতেন। নন্দলালের এই উপদেশ অনুযায়ী স্কেচ্ খাতা হাতে বাইরে ঘুরে

বেড়ানোর অভ্যাস ছাত্রদের মধ্যে প্রথম থেকেই দেখা যায়। অসিতকুমার স্টুডিয়োর কাজ পরিচালনা করতেন। অবনীন্দ্র-পদ্ধতির 'ওয়াশ' অসিতকুমারের মধ্যস্থতায়ই ছাত্ররা পেয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রদের শিক্ষা ও পূর্ত বিভাগের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন এবং প্রয়োজনমত কলাভবনের ছাত্রদের উপদেশ দিতেন।

১৯২১ সালে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা হয়। বিশ্বভারতী-প্রতিষ্ঠার কাল নানা দিক দিয়ে স্মরণীয়। যে মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ আন্তর্জাতিক শিক্ষার আদর্শ দেশের সামনে উপস্থিত করলেন সেই মুহূর্তে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন এবং চরকা-আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের সঙ্গে সহানুভূতি-সম্পন্ন যে-সব ছাত্র, ছাত্রী, অধ্যাপক সেই সময় সরকারি স্কুলকলেজ ছেড়ে বিশ্বভারতীতে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা বিশ্বভারতীকে দেখেছিলেন জাতীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারার বিবর্তনের এক নূতন অধ্যায় বলেও এই মুহূর্ত স্মরণীয়। ইংরাজ-প্রবর্তিত শিল্প-আদর্শের পরিবর্তে ফরাসী শিল্পের সর্বগ্রাসী প্রভাবের সূচনারূপেও এই সময়কে চিহ্নিত করা সংগত।

অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষানীতির নূতন পরিকল্পনা এই পরিবেশের একটি উজ্জ্বল প্রকাশ। নন্দলাল হলেন নূতন কালের আচার্য ও পথপ্রদর্শক।

অবনীন্দ্র-প্রবর্তিত শিল্পধারার সর্বপ্রধান ধারক ও বাহক ছিলেন নন্দলাল। কিন্তু গুরুর আঙ্গিক অপেক্ষা ভারতীয় চিত্রের পরম্পরা তিনি বিশেষভাবে আয়ত্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। পরম্পরার মূল্য তিনি যেমন ভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন অনুরূপ মনোভাব সে সময় শিল্পীসমাজে জনপ্রিয় ছিল না। নন্দলাল রূপ-নির্মাতা। অপর দিকে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পরম্পরার চর্চা, উভয়ের মধ্যে সংযোগের পথ তাঁর শিল্পীজীবনের সূচনা থেকেই লক্ষ্য করা যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সতীর্থ ও পরবর্তী কালের শিল্পীগোষ্ঠীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। আলংকারিক বিন্যাস ও রেখার সুস্পষ্টতা— এই বৈশিষ্ট্য ইতিমধ্যে শিল্পীসমাজে জনপ্রিয় হয়েছিল নন্দলালের প্রভাবে।

কেবল হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়ার মধ্যেই নন্দলালের কর্মজীবন সীমাবদ্ধ ছিল না। শিক্ষকতা ছাড়া আশ্রমের উৎসব-অভিনয় সম্বন্ধে পরিকল্পনা ছিল তাঁর আর-একটি দায়িত্ব। এক দিকে ঘরে বসে চিত্রচর্চা অপর দিকে গোষ্ঠীগত জীবনের ক্ষেত্রে এই শিক্ষার প্রয়োগ উভয়ের সংযোগে গড়ে উঠেছে নন্দলালের বিশিষ্ট শিক্ষার পদ্ধতি।

প্রসঙ্গক্রমে আরো একটি বিষয়ের উল্লেখ করা দরকার। অবনীন্দ্রনাথের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, ব্যক্তিগত জীবনে জাতীয়তা-বোধ, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি অবিচলিত আস্থা— এই ভাবধারার সঙ্গে নন্দলালের জীবনে দেখা দিল রবীন্দ্রনাথের প্রগতিবাদী আন্তর্জাতিক শিক্ষার আদর্শ। বিভিন্ন ভাবধারার সমন্বয়ের চেষ্টা নন্দলালের দায়িত্বকে অনেক পরিমাণে জটিল করে তুলেছিল।

যে সময় নন্দলাল কলাভবনের আচার্যের পদ গ্রহণ করেন (১৯২০-২১ সালে) সেই সময় ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণায় তিনি উপনীত হয়েছেন।

অসিতকুমারের নেতৃত্বে কলাভবন যেমনভাবে শুরু হয়েছিল নন্দলাল সে ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তনের চেষ্টা করেন নি। প্রয়োজনও ছিল না। কারণ উভয়েই অবনীন্দ্রনাথের কাছ থেকে স্বাধীনভাবে শিল্পচর্চার তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার আদর্শও ভিন্ন ছিল না।

স্বাধীন পরিবেশের উপযোগিতা সম্বন্ধে নন্দলালের মনে কোনো সন্দেহ না থাকলেও তিনি অভ্যাস ও অনুশীলনের পক্ষপাতী ছিলেন। মৌলিক রচনার কালে পূর্ণ স্বাধীনতা, অপর দিকে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, পরম্পরা অনুশীলন— এইভাবে ছাত্রদের পরিচালিত করার চেষ্টা নন্দলাল প্রথম থেকেই করেন। নন্দলাল শিক্ষার প্রয়োজনীয় অঙ্গগুলি সম্বন্ধে ছাত্রদের সচেতন করলেন কিন্তু কোনো একটি নির্দিষ্ট পথ দেখালেন না। তাই কলাভবনের প্রথম ছাত্ররা নিজেদের রুচি মেজাজ অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ পেলেন। একটি বিষয়ে নন্দলাল প্রত্যক্ষভাবে ছাত্রদের প্রভাবান্বিত করেন, তা হল রূপ-নির্মাণের দৃঢ়তা ও কালো-সাদার বিন্যাস। রঞ্জিত ছবির উপর কালো ও সাদা টুকরো কাগজ

রেখে তিনি বুঝিয়ে দিতেন বর্ণের উজ্জ্বলতার সঙ্গে কালো-সাদার উপযোগিতা। যে বিষয়টি তিনি সংশোধন করতেন সেটি প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণের পথে পরীক্ষা করে নেওয়ার নির্দেশ দিতেন। এইভাবে চিত্ররচনার কালে পদে পদে ছাত্রদের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে আচার্যকৃত সংশোধনের তাৎপর্য বুঝে নিতে হত।

কোনো নির্দিষ্ট পথে পরম্পরা-চর্চার নির্দেশ নন্দলাল সে সময় দেন নি। আদর্শরূপে যে-কোনো দেশের পরম্পরা অনুশীলন তৎকালীন ছাত্রদের পক্ষে সহজ ছিল। প্রায় প্রত্যেক ছাত্রই সে সময় নিজের রুচি অনুযায়ী পরম্পরা বেছে নিয়েছিলেন। কেউ চীনে বা জাপানি কেউ-বা মোগল রাজপুত, কেউ-বা বিলেতি জলরং বা আর্ট জার্নালের পুরানো পাতা উল্‌টিয়ে রুচি মেজাজ অনুযায়ী কেউ আবার পরম্পরার উপাদান সংগ্রহ করতেন। এইভাবে গুরু-চণ্ডালী দোষ ছবিতে কখনো কখনো প্রকাশ পেত এবং নন্দলাল উপদেশ বা সংশোধনের পথে ছাত্রদের কিছুটা দেশী ঘেঁষা করে তুলতেন।

নন্দলাল যখন কলাভবনের আচার্য তখনো তাঁর ব্যক্তিত্ব দেশে স্বতন্ত্র হয়ে দেখা দেয় নি। তিনি যে শিক্ষা দিয়েছিলেন সেটি অবনীন্দ্রনাথের প্রক্ষেপ বলেই সকলে দেখেছিলেন। সে কারণে অবনীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করার স্পৃহা ছাত্রদের মুছে যায় নি বা তেমন নিস্তেজ হয় নি। মূলত ওয়াশ-রীতিতে ছবি-আঁকার ইচ্ছা অনেক ছাত্রেরই তখন ছিল। এই পদ্ধতি অনুশীলন সম্বন্ধে নন্দলালের আগ্রহ ছিল কিছু কম। অসিতকুমারের কাছ থেকে ছাত্ররা ওয়াশ শিখবার চেষ্টা করেছিলেন। অপর দিকে নন্দলাল ছাত্রদের চালিত করেছিলেন টেম্পারা পদ্ধতি অনুশীলনের পথে। অসিতকুমার প্রয়োজনমত ছাত্রদের পরিচালিত করতেন এবং সকল সময়েই তাঁর উপদেশ ছিল নন্দলালের কাছ থেকে পাঠ গ্রহণ। অসিতকুমারের মতে অবনীন্দ্র-গোষ্ঠীর মধ্যে একমাত্র নন্দলালই শেখাতে জানেন এবং শেখাতে পারেন। তিনি বলতেন যে, 'আমি ছবি আঁকতে আঁকতে ছবি-আঁকা শিখেছি। ছবি-আঁকা শেখানো আমার কর্ম নয়। অবনবাবুও তোমাদের নন্দলালের মতো কষ্ট করে শেখাবেন না।' অসিতকুমারের সরল ও আন্তরিক উক্তির প্রভাবে ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষক

নন্দলালের সম্বন্ধে যে আস্থা দৃঢ়তর হয়েছিল এ কথা সহজেই অনুমান করা যায়। নন্দলালের অধীনে সকালে ছাত্ররা কাজ করতেন, দ্বিপ্রহরে আশ্রমবাসী মহিলারা আসতেন ছবি আঁকা, মাটির কাজ ইত্যাদি করতে বা শিখতে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস প্রায় সময়েই চলত কলাভবনে। ছোটো বড়ো সকলেই নিজের মতি মেজাজ অনুযায়ী কাজ করতেন। শিল্পবোধে তারতম্য থাকলেও শিক্ষার রীতি পদ্ধতির মধ্যে সে সময় কোনো পার্থক্য ছিল না। সন্ধ্যায় নানা সভা সমিতি এবং আলোচনা-সভায় বিশ্বভারতীর সকল ছাত্র শিক্ষক উপস্থিত থাকতেন। এই ছিল বিশ্বভারতীর ছাত্রদের দৈনন্দিন জীবন।

স্টেলা ক্রামরিশ

ভারতীয় শিল্পের নবজাগরণের ক্ষেত্রে হ্যাভেলের অবদান সর্বজনস্বীকৃত। ক্রামরিশকে আমরা অনেকে শিল্প সমালোচক হিসাবেই জানি। কিন্তু আধুনিক ভারতীয় শিল্প-দৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর অবদানকে আজও আমরা যথার্থ স্বীকৃতি দিই নি। হ্যাভেলের সঙ্গে তাঁর তুলনা করলে এটুকু বলা চলে যে ভারতীয় ভাবাদর্শের দিকে যেমন হ্যাভেল আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তেমনি ভারতীয় শিল্পের উপাদান আঙ্গিক নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করে ক্রামরিশ ভারতীয় শিল্পীদের কাছে আর একটি দৃষ্টিকোণ খুলে দিলেন। ক্রামরিশের এই অবদান স্বক্ষেত্রে অনন্য। ১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথ স্টেলা ক্রামরিশকে কলাভবনের শিল্প-সমালোচকরূপে নিয়ে আসেন লণ্ডন থেকে। স্থির হয় ক্রামরিশের ক্লাসে শিক্ষক ও ছাত্র সকলেই উপস্থিত থাকবেন। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে এই বিষয়টি আবশ্যিক করা হয়। স্টেলা ক্রামরিশ যখন শান্তিনিকেতনে যোগ দিলেন তখন তিনি পণ্ডিত-সমাজে সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং অনেক বিষয়ে অনভিজ্ঞ। ক্রামরিশের বক্তৃতা শুরু হয় গথিক শিল্পের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে। ক্রমে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত কয়েকজন শিল্পী সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেন। এই আলোচনা

প্রসঙ্গে টিশিয়ান, ডুরার ও রেমব্রান্ট সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত বিশদ আলোচনা করেন ক্রামরিশ।

ইম্প্রেশনিজ্‌ম (Impressionism) থেকে কিউবিজ্‌ম পর্যন্ত বিশদ আলোচনা যে সময় ক্রামরিশ করেছিলেন তখন ভারতের শিল্পীসমাজ এ বিষয়ে সচেতন হন নি। এইসব শিল্পীদের আদর্শ, উদ্দেশ্য, কৃতকার্যতা, ব্যর্থতা বিষয়ে নানা তথ্য ও বিশ্লেষণের পথে আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যের তিনি আলোচনা করেন।

ভারতীয় শিল্পের অন্তর্নিহিত ভাব অপেক্ষা রূপকল্পনার তাৎপর্য ও আঙ্গিক-গত বিচার-বিশ্লেষণ ক্রামরিশের আলোচনার বিষয় ছিল।

ভারতীয় শিল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে অমরাবতী, অনুরাধাপুর ইত্যাদি স্থানের উৎকীর্ণ মূর্তির বিশ্লেষণ ছাত্র ও অধ্যাপকরা করেছিলেন। শিল্পরূপের বিমূর্ত উপাদান সংক্রান্ত বিষয়গুলি বিশ্লেষণের পথে লক্ষ্যগোচর করার কতক-গুলি উপায় ক্রামরিশ শিল্পীদের সামনে উপস্থিত করেন। এই প্রসঙ্গে ছবি নানা দিক দিয়ে দেখে কিভাবে চিত্রের বিষয়বহির্ভূত নির্মাণ লক্ষ্য করতে পারা যায় এটি ছাত্রদের তিনি দেখালেন। তাঁর মতে ছবির সোজা দিকে বিষয়ের আকর্ষণ প্রধান। উল্টো করলে বিষয় অদৃশ্য হয়। পরিবর্তে দেখা দেয় ছবির বিমূর্ত গুণ। তাঁর এই বিশেষ পদ্ধতির দ্বারা সে সময় ছাত্ররা উপকৃত হয়েছিলেন। ছাত্রদের রচনার ত্রুটি বিচ্যুতি সম্বন্ধে ক্রামরিশের অধৈর্য ও কটু সমালোচনা বহু ক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিগত রুচি-মেজাজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত।

রহস্যপ্রিয় অসিতকুমার বলতেন ক্রিটিককে নিয়ে ঘর করা একটি বিড়ম্বনা। তবে ক্রিটিক যে সকল-সময়েই বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছেন তা নয়। তরুণ শিল্পীদের প্রতি ক্রামরিশের গভীর সহানুভূতি তখন সকলেই অনুভব করেছিলেন। রচনার দোষত্রুটি যেমন লক্ষ্য করতেন তেমনি অনায়াসে তিনি আবিষ্কার করতে পারতেন রচনার মৌলিকতা বা ছাত্রদের উদ্‌ভাবনী শক্তি। ক্রামরিশের দৃষ্টি যে তীক্ষ্ণ ও বিশ্লেষণ করার শক্তি যে অসাধারণ এ বিষয়ে অধ্যাপকদের মনের সন্দেহ দূর হতে বিলম্ব হয় নি। ক্রামরিশের বক্তৃতার বিশ্লেষণমূলক শিক্ষা পাশ্চাত্য শিল্পের বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার সন্ধান দিয়ে কলাভবনের শিল্পীদের

যে তিনি আধুনিকতার দিকে এগিয়ে দিতে সাহায্য করেছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ক্রামরিশ ও গগনেন্দ্রনাথের সহযোগিতায় ১৯২২-২৩ সালে ক্যান্ডিনেস্কি প্রমুখ জার্মান শিল্পীদের ড্রইংএর প্রদর্শনী হয় ওরিয়েন্ট্যাল আর্ট সোসাইটিতে। এই প্রদর্শনীতে প্রথম আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়ের সুযোগ ঘটে কলিকাতা শহরবাসীর।

আঁদ্রে কারপেলে

কলাভবন গড়ে ওঠার মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ বা নন্দলালের লক্ষ্য একই পথ ধরে চলেছিল কি না বলা সম্ভব না হলেও কতকগুলি ঘটনার সাহায্যে সমকালীন অবস্থা-ব্যবস্থার পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। এই সময় ফরাসী মহিলা শিল্পী আঁদ্রে কারপেলের কাছে ছাত্রদের পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে চিত্রবিদ্যা শিক্ষার সুযোগ ঘটে। বিষয়টি আবশ্যিক করা হয় নি। দুইজন ছাত্র একজন ছাত্রী স্বেচ্ছায় অয়েল-পেন্টিং শিক্ষা শুরু করেন। স্টিল লাইফ, পোর্ট্রেট, ল্যাণ্ডস্কেপ এইগুলি ছিল শিক্ষার বিষয়। কারপেলে ছিলেন নব্য কালের শিল্পী। পোস্ট-ইমপ্রেশনিজম যুগের শিল্পীরা ছিলেন তাঁর আদর্শ। তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি ছিল এই আদর্শের দ্বারা প্রভাবান্বিত। কারপেলে ছিলেন কাঠ-খোদাই engraving-এর কাজে দক্ষ। এই দিক দিয়ে তাঁর ছিল বিশেষ প্রতিষ্ঠা। কাঠ-খোদাই কাজের প্রবর্তন তাঁরই মধ্যস্থতায় ঘটেছিল।

কারপেলে ও প্রতিমা দেবীর সহযোগিতায় এই সময় হাতের কাজের শিক্ষার জন্য নূতন বিভাগ খোলা হয়, নাম দেওয়া হয় বিচিত্রা। এটি শিল্পভবনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এখান থেকেই শ্রীনিকেতনের সূচনার বীজ। তৎকালীন কারখানার একটি ঘরে এই বিভাগের কাজ শুরু হয় (১৯২১-১৯২২)। নূতন ব্যবস্থামতে কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের হাতের কাজ শেখা আবশ্যিক করা হয়। শিক্ষার বিষয় ছিল এইগুলি— কাঠ-খোদাই, বই-বাঁধাই, লিথোগ্রাফ, গালার কাজ, অয়েল-পেন্টিং, ফ্রেস্কো ও আলপনা।

ছাত্র-ছাত্রীরা অপরাহ্ণে হাতের কাজ শিখতে যেতেন। উড্‌কাট ও অয়েল-

পেন্‌টিং শেখাতেন আঁদ্রে কারপেলে। ইলামবাজারের পরম্পরাগত প্রৌঢ় কারিগর রূপচন্দ্র গুঁই ছিলেন গালার কাজের শিক্ষক। অধিকাংশ কারিগরের মতোই তাঁর মেজাজ ছিল রুক্ষ; কিন্তু তিনি ছিলেন আদর্শ গুরু। কোনো একটি করণ-কৌশল সম্পূর্ণ আয়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত অন্য বিষয় জানবার আগ্রহ তিনি অত্যন্ত অপছন্দ করতেন। বই-বাঁধাই শেখাতেন একজন সাঁওতাল, নাম শুক্রা। পিয়ার্সন সাহেব শুক্রাকে কলকাতা থেকে বই বাঁধাই-এর কাজ শিখিয়ে এনেছিলেন। লিথোপ্রেস চালাবার জন্য একজন অভিজ্ঞ লিথোম্যান নিযুক্ত হয়েছিলেন। কোনো অভিজ্ঞ শিল্পী এই বিভাগে না থাকায় এই বিভাগের কাজ বেশি দূর অগ্রসর হয় নি। ইতিপূর্বে প্রতিমা দেবী প্যারিস থেকে ফ্রেস্কো-পদ্ধতির কাজ শিখে এসেছিলেন। তিনি এই বিভাগের তত্ত্বাবধান করতেন।[১]

এই সময়ের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা অবনীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে আগমন। অবনীন্দ্রনাথকে সমারোহের সঙ্গে আম্রকুঞ্জে অভিনন্দিত করা হয় রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে। এই উপলক্ষে অবনীন্দ্রনাথ যা বলেন তার থেকে তাঁর শিষ্যবর্গরা উপলব্ধি করলেন যে শিল্পের সমকালীন অবস্থা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর মন হতাশাপূর্ণ। তাঁর অনবদ্য বক্তৃতার সারাংশ মাত্র এখানে দেওয়া গেল—

> "অবনীন্দ্রনাথ ১৩২৯ সালে (শান্তিনিকেতনে) আশ্রম পরিদর্শন করিতে আসেন।
>
> অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে শিল্পের সমকালীন অবস্থা সম্বন্ধে উক্তি করেন ও পাঁচ বৎসর প্রদর্শনী বন্ধ করিয়া দিতে বলেন।... নন্দলাল প্রমুখ শিষ্যদের কাছ থেকে তিনি গুরুদক্ষিণারূপে কুটীর শিল্পের জাগরণ দাবি করেন।... তিনি বলেন আমাদের দেশের শিশুরা ছোটোবেলায় এমন কোনো খেলনা পায় না যাহার সাহায্যে তাহাদের শিশুচিত্ত অনায়াসে কল্পরাজ্যে বিচরণ

১ প্রতিমা দেবীর গুরুর নাম R. La Montagne St. Hubert. Montagne-এর লেখা *The Art of Fresco Painting* (1924) কলাভবনে বহুল ব্যবহার হয়েছে।

করিতে পারে। এই সমস্ত শিশুদের হাতে সুন্দর সুন্দর খেলনা দিতে পারিলে তবেই তাঁহাদের গুরুদক্ষিণা দেওয়া সার্থক হইবে। এইরকমে শিশুকাল হইতে নানা রকম খেলনার সাহায্যে শিশুদের চিত্তে শিল্পের প্রতি অনুরাগ জাগাইয়া দিতে হইবে। বড়ো হইয়া আমরা যে শিল্পসাধনা করি, শিশুকাল হইতেই তাহার সহিত যদি আমাদের পরিচয় না ঘটে তাহা হইলে আমাদের সে সাধনা কিছুতেই সম্পূর্ণ হইবে না।

তিনি আরো বলেন যে প্রত্যেক শিল্পীকেই স্বাধীনভাবে নিজের আদর্শ চিত্রে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে যেন তাহারা তাহাদের অধ্যাপকদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করে। কেননা অন্যের আদর্শে ছবি আঁকিতে গেলে প্রথমত কিছুতেই তাহারা সে আদর্শকে সম্পূর্ণতা দিতে পারিবে না।

দ্বিতীয়ত তাহাদের নিজেদেরও যে বৈশিষ্ট্য ছিল তাহাও তাহারা হারাইয়া ফেলিবে।··· প্রত্যেক শিল্পীই তাহার আর্টে এমন একটি জিনিস প্রকাশ করুক, যেটি কেবল তাহারই জিনিস, অন্যের নিকট হইতে ধার করা নয়।"[১]

শিল্প-সমালোচনার ক্লাস, অয়েল-পেন্‌টিং ইত্যাদি প্রবর্তন সম্বন্ধে নন্দলালের মনোভাব অনুমান করা সম্ভব নয়। তবে অবনীন্দ্রনাথের বক্তৃতা নন্দলালকে কতটা উত্তেজিত করেছিল তার প্রমাণ নন্দলালের পরবর্তী কালের কর্মনীতি ও শিক্ষানীতি থেকে জানতে পারি। অপর দিকে স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীনভাবে শিল্পসৃষ্টির আদর্শ সম্বন্ধে ছাত্রদের সংশয় কাটল। যে সময় অবনীন্দ্রনাথ গৃহজাত শিল্পের জাগরণের দাবি উপস্থিত করেছিলেন তাঁর শিষ্যদের সামনে, তার কিছু পূর্বে সুকুমারী দেবীকে ছাত্রীরূপে নন্দলাল পেয়েছিলেন।

সুকুমারী দেবী এসেছিলেন পূর্ববঙ্গের মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। আলপনা দেওয়ার অভ্যাস তিনি অর্জন করেছিলেন শান্তিনিকেতনে আসার পূর্বে। আলপনার কাজে সুকুমারী দেবীর দক্ষতা ছিল অসাধারণ। সুকুমারী দেবীর

১ দ্র. শান্তিনিকেতন পত্রিকা।

তত্ত্বাবধানে ছাত্র-ছাত্রীরা আলপনা, সেলাইয়ের কাজ শিখতে শুরু করেন। একবছরের মধ্যে বিচিত্রা তথা শিল্পভবনের কাজ বন্ধ হয়ে যায় ও এই বিভাগ শ্রীনিকেতনে স্থানান্তরিত হয়। এন্‌গ্রেভিং, ফ্রেস্কো এই দুটি কাজ কলাভবনের শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে ওঠে অল্পকালের মধ্যে।

এই বিদেশী আঙ্গিকগুলিকে ভারতীয় ছাঁচে ঢেলে সাজাবার দিকে নন্দলাল উৎসাহিত হন এবং তাঁর যোগ্য ছাত্র রমেন্দ্রনাথকে এন্‌গ্রেভিং সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সকল রকমের সুযোগ দেন। এই সময় বিশেষ বিশেষ প্রবণতা অনুযায়ী ছাত্রদের কাজ করার সুযোগ ছিল যথেষ্ট। যে-সব ছাত্র ভিত্তিচিত্র সম্বন্ধে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন নন্দলাল তাঁদের উৎসাহিত করেছেন এবং নিজেও ছাত্রদের সঙ্গে একযোগে কাজ করেছেন। এই ভাবে জাপানি পদ্ধতির উড্‌কাটের করণ-কৌশল অনুসন্ধানের চেষ্টা শুরু হয়। অপর দিকে প্রতিমা দেবীর দ্বারা প্রবর্তিত বিদেশী ফ্রেস্কো-পদ্ধতি প্রবর্তনের মুহূর্ত থেকে তিনি অনুসন্ধান শুরু করেন ভারতীয় ভিত্তিচিত্রের করণ-কৌশল সম্বন্ধে। এই অনুসন্ধানের কালে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র শিষ্য পণ্ডিত হরিদাস মিত্রের সাহায্যে তিনি ও অসিতকুমার "শিল্পরত্ন" নামক প্রাচীন শিল্পশাস্ত্র থেকে ভারতীয় ভিত্তি-চিত্রের করণ-কৌশল সংক্রান্ত অংশগুলির অনুবাদ শুরু করেন।

নন্দলাল ছাত্রদের বিলেতি কাঠ-কয়লার পরিবর্তে কিট্টলেখনী[১] প্রস্তুত ও ব্যবহার করতে উৎসাহিত করলেন। একই সঙ্গে শিল্পশাস্ত্র অনুযায়ী মাটির আস্তর তৈরি করে ভিত্তিগাত্র চিত্রিত করা হল।

যে সময় নন্দলাল প্রমুখ আচার্যরা প্রাচীন ভিত্তিচিত্র সম্বন্ধে অনুসন্ধান করছিলেন সেই সময় অবনীন্দ্রনাথ জনৈক তিব্বতী শিল্পীকে নিযুক্ত করেন। অবনীন্দ্রনাথের নির্দেশে নন্দলাল কলকাতায় যান এবং ব্যানার পদ্ধতি (তান্‌কা)

১ তিনভাগ মিহি সুরকির সঙ্গে একভাগ গোবর মোলায়েম করে মিশিয়ে রোদ্দুরে শুকিয়ে নেওয়ার পর দেশী রঙিন চকের মতো কাজ করা চলত। সাদা কাগজে রেখাঙ্কনের জন্য এটি খুবই উপযুক্ত ছিল।

শিক্ষা করে কলাভবনে ফিরে আসেন। কয়েকজন ছাত্র উৎসাহের সঙ্গে ব্যানার-পদ্ধতি অনুশীলন শুরু করেন। অল্পদিনের মধ্যে যে করণ-কৌশলগুলি প্রবর্তিত হল তার কোনোটি আবশ্যিক হয় নি। ছাত্ররা নিজের ইচ্ছানুযায়ী বেছে নিয়েছিলেন এক-একটি বিষয়।

শিক্ষার এই বিধিব্যবস্থা থেকে সহজেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে সে সময় ছাত্ররা নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম অনুসরণ না করে বিশেষজ্ঞের মতো শিল্পচর্চা করেছিলেন। কাগজপত্রে তিন বৎসর সাধারণ শিক্ষা এবং দুই বৎসর বিশেষ শিক্ষার নির্দেশ তখন অনুসরণ করা হয় নি।

বাঘগুহা

১৯২২-২৩ সালে কলাভবনের অধ্যাপকবৃন্দ বাঘগুহা অনুলেখনের জন্য গোয়ালিয়র যাত্রা করেন। সেই সময় ছাত্রদের উপর কতকগুলি অনুলেখনের কাজ দিয়ে যান নন্দলাল। অনুলেখনের বিষয় ছিল দেশী ও জাপানি ছবি। ছাত্ররা মৌলিক রচনায় অগ্রসর হতে না পারলে এই অনুলেখন (copy) চর্চার সাহায্যে তারা কাজে নিযুক্ত থাকবে— এই মনোভাব নিয়েই অনুলেখনের প্রবর্তন করেছিলেন নন্দলাল।

বাঘগুহা থেকে আচার্যরা চিত্রিত পোস্ট-কার্ড পাঠাতেন এবং ট্রেসিং পাঠাতেন ছাত্রদের অনুলেখনের জন্য।

বলা বাহুল্য, ছাত্ররা মৌলিক রচনা, স্কেচ্‌ ইত্যাদিতেই মগ্ন ছিলেন। অনুলেখনের কাজ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসমাপ্ত রয়ে গেল। গোয়ালিয়র থেকে ফিরে আসার পর বাঘগুহার সম্পূর্ণ রেখাচিত্র দেখে অর্বাচীন ছাত্ররাও অনুভব করলেন এই পরিকল্পনার অসাধারণত্ব। ১৯২৩ সালে অসিতকুমার অকস্মাৎ আশ্রম ত্যাগ করেন। কলাভবনের সঙ্গে প্রথম থেকে যিনি যুক্ত ছিলেন তাঁর স্থান ত্যাগের কারণ জানা যায় না।[১] রবীন্দ্রনাথের নিকট আত্মীয়, নন্দলালের

১ রবিতীর্থের রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিকী সংস্করণে 'আশ্রম-ত্যাগ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সতীর্থ কলাভবনের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ কাটিয়ে যাবার কালে কোনো প্রকার চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় নি— এইটুকু নিশ্চয় করে বলা যায়। এই সময় থেকে কলাভবনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করলেন নন্দলাল এবং তাঁর সহকারী হলেন সুরেন্দ্রনাথ কর।

অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করার দিকে নন্দলাল সকল সময়েই দৃষ্টি রেখেছিলেন। এই কারণে সারা বছরের কাজ বাৎসরিক প্রদর্শনীর পূর্বে অবনীন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ ছবি দেখে মতামত দিতেন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংশোধন করতেন। ছবিগুলি ফেরত এলে নন্দলাল এইসব সংশোধনগুলি ভালো করে দেখতেন এবং গুরুর মতামত মনোযোগের সঙ্গে শুনতেন। অবনীন্দ্রনাথের সংশোধনগুলির এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল যে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা দরকার। দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল— চিত্রের বিষয় ফেরিওয়ালা চলেছে কলকাতার গলি দিয়ে। ফেরিওয়ালার পিছনে দেয়াল এবং একটি তালাবদ্ধ দরজা। অবনীন্দ্রনাথ ঘসে মুছে রং দিয়ে দরজা ও দেয়ালের জীর্ণতা ফুটিয়ে তুলে শিল্পীকে বলেছেন এইবার গলিটা যে কত পুরোনো তা বোঝা গেল। আর-একটি ছবি— বসন্তের দৃশ্য। বিরাট শিমুল গাছ, তারই পাশে কুটির এবং একটি সাঁওতাল কুটিরের দাওয়ায় বসে আছে। দেখা গেল ছবিটির দুটি অংশই স্বয়ংসম্পূর্ণ। অবনীন্দ্রনাথ ছবিটি দু টুকরো করেন উপবিষ্ট সাঁওতাল সমেত। কুটিরের অংশটি নিজে ক্রয় করেন এবং শিমুল গাছের অংশটি শিল্পীকে ফেরত দেন এবং বলেন দুটি ছবি একসঙ্গে জোড়া লাগানো ছিল, এখন কেটে দেওয়াতে ছবি দুটিতেই স্বাধীন সত্তা ফিরে এল। এই সময় অবনীন্দ্রনাথ পোস্টকার্ডে কলাভবনের শিল্পীদের কাছে নানা রকম উদ্ভট প্রশ্ন পাঠাতেন। যেমন অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'দুটি পালক। একটি সাদা একটি কালো। কী পাখি?' আর-একটি প্রশ্ন, 'প্রাচীন কাল থেকে শিল্পীরা লাল রং কেন ব্যবহার করল?'

উদ্ভট প্রশ্নের ফাঁকে ফাঁকে অবনীন্দ্রনাথের গভীর উপলব্ধিমূলক উক্তি পাওয়া যেত। যেমন, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ প্রসঙ্গে তিনি বলছেন— শিল্পীর তিন

অবস্থা, প্রথমে গুটিপোকার মতো সে খেয়ে যায়, তার পর নিজের রসে নিজেকে সে আবদ্ধ করে, শেষ পর্যন্ত গুটি কেটে বেরিয়ে আসে প্রজাপতি হয়ে। যে গুটি কাটতে পারে না সে মরে।

প্রথম কয় বছরের মধ্যে কলাভবনের জীবনযাত্রা ও শিক্ষাপ্রণালী অনেকখানি নির্দিষ্ট আকার নিয়েছে। ভারতীয় শিল্পধারার নূতন গতির সূচনা অবনীন্দ্রনাথ প্রথম লক্ষ্য করলেন এবং অকুণ্ঠিত ভাবে তাঁর অভিমত প্রকাশ করলেন প্রিয়-দর্শিকা (১৯২৩) পুস্তিকাতে।

এই সময় মেক্সিকোবাসী জনৈক শিল্পরসিক শান্তিনিকেতনে অতিথি হন; সম্ভবত তাঁর নাম ছিল ক্রাইম্যান। ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ছিল যথেষ্ট। এই আগন্তুকের সাহায্যে রমেন্দ্রনাথ প্রথম রঙিন উড্‌কাট করেন। ক্রাইম্যানের হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা না থাকলেও প্যারিস শহরে কোনো জাপানি শিল্পীর কাজ দেখে তিনি যা শিখেছিলেন তাই জানালেন কলাভবনের শিল্পীদের। ক্রাইম্যান মেক্সিকোর আদিবাসীদের দেয়াল-চিত্র সম্বন্ধে নানা খবর রাখতেন। তাঁর কাছ থেকে রঙের সঙ্গে মনসা গাছের আঠা মিলিয়ে দেয়াল-চিত্র করার ইচ্ছা নন্দলালের মনে জাগে। পরীক্ষা করে দেখা যায় যে মনসার আঠাতে রং সম্পূর্ণ জলপ্রতিরোধক।

১৯২৪ সালে গরমের ছুটিতে কলাভবনের কিছু ছাত্র ও অধ্যাপক বদ্রিকাশ্রমে যাত্রা করেন। এই ছুটিতেই নন্দলাল প্রথম ভিত্তিচিত্রের একটি পূর্ণাঙ্গ পরি-কল্পনা অনুযায়ী চিত্র রচনা করেন। প্রথমে তাঁর ইচ্ছা ছিল মনসার আঠা মিশিয়ে দেয়াল-চিত্র করা। অকস্মাৎ তিনি মত পরিবর্তন করেন এবং সহ-কারীকে বললেন যে দেশী জিনিস থাকতে বাইরের জিনিস নেবার কী দরকার? ভাতের মাড় মেশানো রং এবং কেয়ার ডাঁটা ও কঞ্চি ছেঁচে তুলি তৈরি করে নন্দলাল ছবি আঁকা শুরু করেন।

অজন্তার অনুসরণে পদ্মফুলের আলংকারিক বাঁধন এবং নিজের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বাংলার গ্রীষ্মের ফল, মাছ, পাখি ইত্যাদির প্রবর্তন করেন। পরি-কল্পনার কালে নন্দলাল বলে দিতেন কিভাবে পরম্পরা থেকে তিনি গ্রহণ

করছেন এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে কেমন ভাবে পরম্পরার ছাঁদে গড়বার চেষ্টা করছেন।

ইতিমধ্যে কলাভবন লাইব্রেরিতে দেশী ও বিদেশী শিল্পের বহু পুস্তক সংগ্রহ করা হয়েছে। নন্দলাল নিজে বইগুলি দেখতেন এবং ছাত্রদের এইসব মহৎ শিল্পের নিদর্শন দেখতে উৎসাহিত করতেন। বই দেখা সম্বন্ধে তাঁর একটি স্মরণীয় উক্তি—"এইসব শিল্পী মরে গিয়েও জীবন্ত, তোমরা এঁদের কাছে আজও অনেক কিছু শিখতে পারবে। শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখবে এবং মন দিয়ে বুঝবে।"

১৯২৫ সালে রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রীরূপে নন্দলাল চীন জাপান ভ্রমণ করেন। বহু চীনা ও জাপানি পুস্তক, ছবি, রাবিং, প্রিন্ট ইত্যাদির সঙ্গে নন্দলাল শিল্প-চর্চার প্রামাণিক পুস্তকগুলি সংগ্রহ করেন। এই বইগুলি নন্দলালকে খুবই আকৃষ্ট করে এবং এইভাবে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ বা তুলি-চালনা ইত্যাদি ছাত্রদের অভ্যাস করতে উপদেশ দেন। চীনা ও জাপানি শিল্পপরম্পরা আঙ্গিকের দিক দিয়ে দেখার চেষ্টা এই সময় থেকে শুরু হয়।

মৌলিক রচনা, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও পরম্পরা এই তিনের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর করে তুলবার প্রয়াস নন্দলালের শিক্ষানীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই তিন-এর উপযোগিতা সম্বন্ধে শিক্ষাব্রতী মহলে মতবিরোধ নেই, অন্তত সৃষ্টিরত শিল্পীকে এই তিনের সমন্বয়ের পথ অনুসন্ধান করতে হয়। নন্দলাল সৃষ্টিরত শিল্পী। কাজেই সৃষ্টির পথে বাধা-বিপত্তি সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও পরম্পরাগত আঙ্গিকের চর্চা ব্যতীত সৃষ্টিক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব নয় এ কথা তাঁর জানা ছিল।

মৌলিকতা, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও পরম্পরা এই তিনের প্রয়োজন সম্বন্ধে মতভেদ না থাকলেও বিষয়গুলিকে সকলে একভাবে ব্যাখ্যা করেন না।

কলাভবনের শিক্ষানীতিতে উপরের বিষয়গুলি নন্দলাল কিভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন সে সম্বন্ধে এবার আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রকৃতির সংস্পর্শ শিল্পীর অভিজ্ঞতাকে নানা তথ্যে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম। তথ্য অপেক্ষা প্রকৃতির সান্নিধ্যে শিল্পীর মনে যে উপলব্ধি হয় সেটিকেই প্রকৃতি

পর্যবেক্ষণের অত্যাবশ্যকীয় বিষয় বলে রবীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল মনে করতেন। নন্দলালের মতে একাত্মবোধ প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের লক্ষ্য। বস্তু-আশ্রিত তথ্য এই লক্ষ্যে পৌছবার পথ। একাত্মবোধ কথাটির উপর নন্দলাল বিশেষ জোর দিয়েছেন। শিল্পী যেটি দেখবে তার সঙ্গে মনে প্রাণে এক হয়ে গেলে তবেই সে উপলব্ধি করবে বস্তুসত্তা। বুদ্ধি বিচারের পথে কেবলমাত্র তথ্য আহরণ যে শিল্প-চেতনাকে সক্রিয় করে তুলতে পারে না— এ বিষয়ে নন্দলালের মনে কোনোদিন কোনো সংশয় জাগে নি। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে যে কথা পরম্পরা সম্বন্ধেও তিনি একই কথা বলেছেন। আঙ্গিকের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের উপায়রূপে তিনি ছাত্রদের আত্মস্থ হতে বলতেন। তুলির ডগায় মনকে স্থাপিত করলে তুলি শিল্পীর সম্পূর্ণ অধীনে থাকবে। অন্যথায় "হাত ছুটে" যাবে। আঙ্গিক শিল্পীর "দাস, প্রভু নয়"। নন্দলাল ছাত্রদের মন থেকে সকল সময় ভয় দূর করতে বলতেন। তাঁর মতে শিল্পীর মনে সবই সঞ্চিত আছে। নির্ভীক না হলে সেগুলিকে প্রকাশ করা যায় না। অবশ্য মনের ভাণ্ডার ভরে ওঠে প্রকৃতির সান্নিধ্যে এ কথাও তিনি বলতে ভুলতেন না।

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার মুহূর্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ সংগীতে, অভিনয়ে, উৎসবে আশ্রমবাসীর জীবনকে আনন্দে উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন। নন্দলালকে রবীন্দ্রসংগীত বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। তিনি বলতেন যে গুরুদেবের গান থেকে কিভাবে প্রকৃতিকে অনুভব করতে হয়, ভালোবাসতে হয় তা শেখা উচিত। একই বস্তুকে দিনে রাত্রে সকাল সন্ধ্যায় দেখা প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের এই বিশেষ রীতি প্রবর্তিত হয়েছিল ছাত্রদের মধ্যে। একই জিনিসকে বারংবার দেখা এবং বারংবার রূপায়িত করার প্রয়াস ছাত্ররা অনেকেই অভ্যাস করেছিলেন।

পরম্পরাকে বিচার করা চলে দুই ভাগে— এক, জাতীয় অর্থে, দুই, সামগ্রিক অর্থে। কলাভবনের সূচনাকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করেছেন এই শিল্প-কেন্দ্রটিকে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে তুলতে। সেই কারণে তিনি বিভিন্ন কালের বিচিত্র শিল্পীমনের সঙ্গে পরিচয় স্থাপনের পথ উন্মুক্ত

করতে চেয়েছিলেন। এই আদর্শ অনুযায়ী শিল্প-পরম্পরার সমষ্টিগত রূপ ছাত্র ও শিক্ষকরা লক্ষ্য করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

নন্দলালের শিক্ষানীতির প্রভাবে শিল্পীরা ক্রমেই চিত্রের নির্মাণধর্মী গুণ সম্বন্ধে সচেতন হলেন। এই শিক্ষার পথেই সামগ্রিক পরম্পরা থেকে আকারগত বৈশিষ্ট্য (formal and structural element) আয়ত্ত করার প্রয়াস আমরা লক্ষ্য করি। এই সময়টি নন্দলালের জীবনে পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি উজ্জ্বল মুহূর্ত। তাঁর রচনাতে ইজিপ্ট, আসিরিয়া, চীন, ক্যালিগ্রাফী, প্রাচ্যশিল্পের বিভিন্ন উপাদান একত্রে মিলে মিশে যাবার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। কাজেই সমষ্টি-গত ভাবে পরম্পরা আয়ত্ত করার পরিবেশ তখন সম্পূর্ণ অনুকূল।

মৌলিকতা সম্বন্ধে ধারণা সব শিল্পীর একরকম হয় না। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের পথে যে তথ্য আহরণ করা যায় শুধু তারই সাহায্যে চিত্র নির্মাণ, মৌলিক রচনার পর্যায়ভুক্ত হতে পারে না, এ কথা তখন সকলেই মেনে নিয়েছেন। কাজেই বস্তু-আশ্রিতরূপ চিত্রে রূপান্তরিত হওয়া প্রয়োজন। নন্দলাল বিশ্বাস করতেন মণ্ডনের (design) গুণ ব্যতীত চিত্ররূপ সার্থক করে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। মণ্ডনধর্মী গুণ আয়ত্ত করার পথেই ভারতীয় শিল্পের উপাদান সম্বন্ধে তিনি শিল্পীদের সচেতন করেন। প্রকৃতিজাত বস্তু থেকে গতি ও গঠন স্বতন্ত্র ভাবে অনুশীলনের পথে আকারের বিশিষ্টতা সম্বন্ধে একটি ধারণা করে নেওয়ার সহায় রূপে নন্দলাল মণ্ডনরীতি চর্চার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বাস্তব উদ্দীপনা, চিত্রের বাঁধন ও আঙ্গিকের নৈপুণ্য— এই ত্রিধারার সংযোগ নন্দলাল-প্রবর্তিত শিক্ষানীতির প্রথম অবদান।

এই সময় যেমন বাঁধাধরা সিলেবাস তৈরি হয় নি তেমনি বসে কাজ করার জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময় ছিল না। যে কোনো সময় ছাত্ররা বাইরে যেতে পারতেন। আশ্রমের আশেপাশের গ্রামে কর্মতৎপর নরনারীগণ ছিলেন শিল্পীদের মডেল-স্বরূপ। দ্রুত খসড়া করার অভ্যাস এই ভাবে ছাত্রমহলে প্রবর্তিত হয়। বলা যেতে পারে, আর্টস্কুলে যে বিষয়গুলি বিভিন্ন ঘরে শেখানো হত সেইগুলি এই-সব শিল্পীরা মুক্ত পরিবেশ থেকে আয়ত্ত করলেন। লাইফ-

স্টাডি, ফুল-পাতা, পশুপক্ষী সবই ছাত্ররা আয়ত্ত করলেন মুক্ত পরিবেশে, কেবল শিল্পসৃষ্টির কালে তাঁরা কাজ করতেন ঘরে বসে।

প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের প্রধান লক্ষ্য ছিল বস্তু-আশ্রিত গতি ও গঠনের অনুসন্ধান। প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও একাত্মবোধ সম্বন্ধে নন্দলালের মত পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই কারণে প্রকৃতিজাত বস্তু ও বস্তুজাত আবেদন যে পর্যন্ত না আয়ত্তে এসেছে সে পর্যন্ত প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ সমাপ্ত হয় নি বলে ধরে নেওয়া হত।

নন্দলালের শিক্ষাপদ্ধতি প্রসঙ্গে এ পর্যন্ত যে আলোচনা করা হল সে ক্ষেত্রে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের কথাই বিশেষ ভাবে বলা হয়েছে। কারণ এই বিষয়টি ছিল শিল্পীদের শিক্ষার বুনিয়াদ। মৌলিক রচনার ক্ষেত্রে শিল্পীরা ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন। সংশোধনের কালে নন্দলাল প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা করে এই ত্রুটি-বিচ্যুতি বুঝিয়ে দিতেন। সাদা ও কালো কাগজের টুকরো চিত্রিত ছবির উপর রেখে কালো-সাদার সম্বন্ধ ও সংঘাত তিনি অনেক সময় বুঝিয়ে দিতেন। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ বা চিত্ররচনার কালে আকারের জগৎ সম্বন্ধে নন্দলাল তরুণ শিল্পীদের যতটা সচেতন করেছিলেন বর্ণের ক্ষেত্রে তাঁর অনুরূপ মনোভাব তেমন লক্ষ্য করা যায় না। অবশ্য বর্ণের উজ্জ্বলতা ও গভীরতা সম্বন্ধে তিনি ছাত্রদের সচেতন থাকতে বলতেন। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রকৃতি অপেক্ষা দেশী পরম্পরার বর্ণ-সৌষ্ঠব নিজেদের ছবি পাশে রেখে তুলনার পথে বুঝে নিতে বলতেন। অনুলেখনের নির্দেশ ১৯২৫ সাল পর্যন্ত তিনি দৈবাৎ দিয়েছেন। চিত্রের নির্মাণ-রীতি অনুশীলনের প্রয়াস থেকে নন্দলাল প্রবর্তিত শিক্ষাধারা অবনীন্দ্রনাথের সৃষ্ট শিল্পরীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসে। রূপনিষ্ঠ নন্দলালের ছবিতে গঠন, বিন্যাস ও ছবির বাঁধন ইত্যাদির প্রয়োগ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেখা যায়। অবনীন্দ্রনাথের চিত্রধর্মী গুণ ছবিতে কমে আসে ও 'ওয়াশ'-আঙ্গিকে ছবি করার প্রভাবও ক্ষীয়মান হয়ে আসে। পরিবর্তে রঙের উজ্জ্বলতা আনার মানসে দেশী ছবির বর্ণাদর্শ অধিকতর গৃহীত হতে থাকে। সেইসঙ্গে প্রাকৃতিক-ভৌগোলিক প্রভাব বর্ণের ক্ষেত্রে (local colour) বাস্তবাশ্রিত হয়ে দেখা দিল।

আশ্রমের অভিনয় ও উৎসব

আশ্রমে অভিনয় ও ঋতু-উৎসবগুলির সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা এইবার উল্লেখ করতে হয়। শিক্ষক নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও প্রভাবান্বিত। কিন্তু মণ্ডনশিল্পীরূপে তিনি অন্যের মুখাপেক্ষী ছিলেন না। প্রয়োজনের দাবিতে যে পরিকল্পনা তিনি করেন সেগুলিকে শিক্ষার অঙ্গীভূত করে তুলতে কিভাবে তিনি প্রয়াস করেছিলেন এ ক্ষেত্রে এইটিই আমাদের আলোচনার বিষয়।

ঋতু-উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল আলপনা। এ বিষয়ে সুকুমারী দেবী ছিলেন তাঁর সর্বপ্রধান সহায়। তাঁর অধীনে ছাত্রীরা আলপনা দিতেন। অপর দিকে ছাত্ররাও অন্যান্য বিষয়ে নন্দলালের সহকারীরূপে কাজ করতেন। উৎসব উপলক্ষে নন্দলাল কখনো ব্যয়সাপেক্ষ জিনিস ক্রয় করার চেষ্টা করেন নি। সহজলভ্য জিনিসের সাহায্যে উৎসবের পরিকল্পনা করা হত। উৎসবের কালে স্টুডিয়োর কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ থাকত। সকাল-সন্ধ্যায় সকলে এই কাজে আত্মনিয়োগ করতেন। আশ্রমের জীবনযাত্রার সঙ্গে শিল্পীর ঘনিষ্ঠ যোগ ও রুচির ক্ষেত্রে শিল্পের প্রভাব, এই ভাবে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করে এবং কালক্রমে এই প্রভাব দেশের মধ্যে বিস্তৃত হয়। এইসঙ্গে আর-একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার। ৭ই পৌষ উপলক্ষে ছবি এঁকে বিক্রি করার রীতি বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার কাল থেকেই। নন্দলাল এই রীতিকে একটি নির্দিষ্ট শিক্ষাপরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করেন। এক মাস পর্যন্ত অন্যান্য কাজ বন্ধ থাকত, ছাত্র ও শিক্ষকরা কার্ডে ছবি করতেন। কার্ডে ছবি করার সময় সারা বছরের অভিজ্ঞতার পরীক্ষা হত এবং তাঁরা নানা ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে সাহস পেতেন। নন্দলাল নিজে এই উপলক্ষে অসংখ্য কার্ড রচনা করেছেন। চার আনা আট আনা মূল্যে এইগুলি বিক্রি হত। সেই অর্থে ভ্রমণের উপকরণ যথা তাঁবু, বাসনপত্র ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছিল।

বিশ্বভারতীর ইতিহাসে প্রথম ছয় বৎসর বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। কারণ বিশ্বভারতীর জীবন ও শিক্ষাদর্শ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংঘবদ্ধ চেষ্টা এই কয়

বছরে যেমন হয়েছিল অনুরূপ প্রয়াস পরবর্তী কালে লক্ষ্য করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সকল শক্তি নিয়োগ করেছিলেন, বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগের কর্মকে যুক্ত ভাবে পরিচালিত করতে। অবশ্য তাঁর এই চেষ্টা আপিসের বিধি-ব্যবস্থার সাহায্যে হয় নি। সন্ধ্যায় আলোচনা-সভায় রবীন্দ্রনাথ নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন ছাত্র এবং শিক্ষকদের সঙ্গে। সাহিত্য, শিল্পকলা, যৌনবিজ্ঞান গান্ধীজির আদর্শ ইত্যাদি নানা বিষয়ে আলোচনা তিনি করেছিলেন। এই আলোচনার মধ্যে কলাভবনের শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জাপানি কবিতার ধারাবাহিক আলোচনা।

আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ বিষয়ে যে-সব কথা বলেন তৎকালীন শিল্পীদের তা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। শিল্প যে সাধনার বস্তু এবং বাইরের বিচিত্র প্রলোভন থেকে নিজেকে রক্ষা করে জীবনের প্রতি অংশকে পরিণত করার সাধনা, রবীন্দ্রনাথের আলোচনা ও তাঁর অক্লান্ত কর্মশক্তি থেকে তৎকালীন ছাত্র ও শিক্ষকরা তা গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন।

প্রথম পাঁচ বছরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপকদের মধ্যে সৌন্দর্য-সাধনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যে আদর্শ উপস্থিত করেছিলেন তারই প্রভাবে বিশ্বভারতীর জীবনযাত্রা সুনির্দিষ্ট আকার পেয়েছিল। বিভিন্ন মতাবলম্বী বহুসংখ্যক মানুষকে তিনি এক সূত্রে বাঁধতে পেরেছিলেন সৌন্দর্যে সাধনার ক্ষেত্রে। মানুষকে একসূত্রে বাঁধার পথে সাহিত্য শিল্প ও সংগীতের শক্তি সম্বন্ধে কবি রবীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন বলেই সম্ভবত বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠার কালে এইগুলিকে শিক্ষার প্রধান অঙ্গরূপে তিনি দেখেছিলেন। এই দিক দিয়ে শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথের অবদান স্মরণীয়।

৪

কলাভবনের নূতন পর্যায়

কলাভবনের নূতন পর্যায় শুরু হয় ১৯২৫ সালের পর। ইতিমধ্যে কিছু ছাত্র নানা স্থানে চাকুরিতে যোগ দিয়েছেন। পরীক্ষার ব্যবস্থা তখনো প্রবর্তিত হয় নি। উপযুক্ত মনে করলেই নন্দলাল ছাত্রদের সার্টিফিকেট দিয়ে চাকুরিতে যোগ দেবার অনুমতি দিতেন। অপর দিকে রবীন্দ্রনাথের সার্টিফিকেট পেতে অসুবিধে ছিল না।

যাঁরা তখনো কলাভবনে আছেন তাঁরা শিক্ষাদানের কাজে নন্দলালকে সাহায্য করতেন। এই সময় অধ্যাপকের কাজে নিযুক্ত হয়েছেন ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মণ। নন্দলালের সহকারীরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে অধীনস্থ ছাত্রদের নিয়ন্ত্রিত করতেন। প্রয়োজন হলে নন্দলাল শিক্ষকদের উপদেশ দিতেন কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে তাঁদের শিক্ষাপদ্ধতির উপর হস্তক্ষেপ করতেন না। ছাত্রীরা সম্পূর্ণভাবে ছিলেন নন্দলালের অধীনে। সুকুমারী দেবী আলপনা ও সেলাইয়ের কাজ শেখাতেন।

শিক্ষার বিধি-ব্যবস্থা ও বিষয় একই রকম থাকলেও অলংকরণ-কর্ম সম্বন্ধে ছাত্রীদের নন্দলাল যে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করছেন এটি পুরাতন ছাত্ররা তখন সহজেই লক্ষ্য করেছেন। ইতিমধ্যে আলপনা সরল গ্রাম্য ভাব থেকে মুক্তি পেয়ে মার্জিত জটিল অলংকরণে পরিণত হয়েছে। প্রকৃতিজাত বাস্তব রূপকে আলংকারিক বাঁধনে পরিণত করার পথে আলপনাকে নন্দলাল প্রধান অবলম্বনরূপে দেখেছিলেন। ছাত্রীদের অন্যান্য রচনাতে আলংকারিক বিন্যাসের আভাস ইঙ্গিত এই সময় প্রথম লক্ষ্য করা যায়।

এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথ কলাভবনের শিল্পশিক্ষার আদর্শকে ব্যাপক ক্ষেত্রে চালিত করার চেষ্টা শুরু থেকেই করেছিলেন। বিদেশ-ভ্রমণের কালে সহযাত্রী রূপে একজন শিল্পী প্রায় সময়ই তাঁর সঙ্গে থেকেছেন। প্রতিমা দেবীর মধ্যস্থতায় ফ্রেস্কো, নন্দলালের সাহায্যে চীন

জাপানের ছবির নানা তথ্য এবং সুরেন্দ্রনাথের সাহায্যে লিথোগ্রাফের নূতন পর্যায় শুরু হয়।

লণ্ডন থেকে সুরেন্দ্রনাথ কর লিথোগ্রাফ ও বই বাঁধাইয়ের কাজ শিখে আসেন। নূতন উদ্যমে লিথোর কাজ শুরু হল। রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ছিলেন এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী। নন্দলালের পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলার পুতুলের অ্যালবাম ছাপা শুরু হয়। কিন্তু এ কাজ বেশি দূর অগ্রসর হয় নি। লিথো-পদ্ধতিতে রমেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য ইচ্ছুক ছাত্ররা ছবি করলেন। সুরেন্দ্রনাথ তখন পূর্ত বিভাগ ও অন্যান্য দায়িত্ব নিয়ে এতই ব্যস্ত যে বেশিদিন তিনি এই বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন নি। তাঁর অবর্তমানে রমেন্দ্রনাথ কিছুকাল এই বিভাগটিকে চালু রাখেন। তার পর লিথোর কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

ভিত্তিচিত্র সম্বন্ধে উৎসাহ ইতিমধ্যে কিছুটা নিষ্প্রভ হয়ে এসেছিল। লাইব্রেরির উপরতলায় কলাভবন স্থানান্তরিত হবার পর নন্দলালের ইচ্ছা হয় কলাভবনের দেওয়ালে ভিত্তিচিত্র অঙ্কনের। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী জয়পুরের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ কারিগর নরসিংলালকে নিযুক্ত করা হয়।[১] নরসিংলাল যখন শান্তিনিকেতনে কাজে নিযুক্ত হন তখন জয়পুরে তাঁর পদমর্যাদা সাধারণ মিস্ত্রী অপেক্ষা অধিক ছিল না। নন্দলাল ছাত্র ও অধ্যাপক সকলকে জানালেন যে, 'কে শিক্ষক কে ছাত্র এ কথা যেন নরসিংলাল না জানতে পারে। তার সঙ্গে তোমরা সকলে জোগাড়ের মতো কাজ করবে এবং তার হুকুম বিনাবাক্যে পালন করবে।' নন্দলালের আদেশ শিল্পীরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন এবং প্রয়োজন হলে নন্দলালও জোগাড়ের কাজ করেছেন। বহুদিন পর্যন্ত নরসিংলাল জানতে পারেন নি যে নন্দলাল তাঁর মনিব। কাজের সময় বৃদ্ধ নরসিংলালের মেজাজ অত্যন্ত রুক্ষ থাকত, অকথ্য গালিগালাজ করতে দ্বিধা করতেন না কারণ তাঁর ধারণা ছিল সকলেই তাঁর জোগাড়ে।

প্রাচ্য শিল্পের বিভিন্ন পরম্পরার দৃষ্টান্ত নরসিংলালের সাহায্যে চিত্রিত হয়।

১ নরসিংলালকে জয়পুর থেকে পাঠান শৈলেন দে।

শিল্পীরা নরসিংলালকে সাহায্য করতেন এবং ছোটো টালির উপর জয়পুর-পদ্ধতির কাজ নিয়মিত অভ্যাস করতেন।

দেশীয় কারিগরদের সঙ্গে শিল্পীদের সম্বন্ধ স্থাপনের আদর্শ এক সময় হ্যাভেল দেশের সামনে উপস্থিত করেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে সে চেষ্টা সফল হয় নি। কারিগরদের প্রতি নন্দলালের গভীর সহানুভূতি ও উপযুক্ত মর্যাদা দেবার কারণেই কলাভবনের শিল্পীরা নরসিংলালকে গুরুরূপে শ্রদ্ধা করতে এবং উপযুক্ত মর্যাদা দিতে শিখলেন। এই শ্রদ্ধার প্রতিদানে নরসিংলাল অকুন্ঠিত চিত্তে ছাত্রদের করণ-কৌশলের খুঁটিনাটি যত্নের সঙ্গে শিক্ষা দিলেন। তাঁর কাছ থেকেই জানা গেল শান্তিনিকেতন-পূর্ব তাঁর কারিগরী জীবন কতই না লাঞ্ছনার ছিল। এখানকার মতো ব্যবহার তিনি পূর্বে কোথাও পান নি। নরসিংলালের কাছে ছাত্ররা তিনমাস জয়পুর-পদ্ধতি অভ্যাস করেছিলেন। প্রধানত ছাত্ররাই এ কাজ করেছিলেন।

নরসিংলাল চলে যাওয়ার পর নূতন উৎসাহে দেওয়াল-চিত্রের কাজ শুরু হয়। ইতালীয় বা জয়পুর-পদ্ধতির পরিবর্তে শিরিস, গঁদ বা ডিম -মেশানো রঙে সমবেত ভাবে ছাত্র ও শিক্ষক আশ্রমের ছাত্রাবাস, হাসপাতাল ইত্যাদি চিত্রিত করেন। পরীক্ষা বা অ্যাসেসমেণ্ট, হাজিরি-খাতা ইত্যাদি না থাকায় শিল্পীরা সম্পূর্ণভাবে এই কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্বাধীনতাই ছিল এই কাজের সর্বপ্রধান লক্ষ্য।

এই-সব ছবির কিছুই আজ অবশিষ্ট নেই। বিশ্বভারতীর নূতন পরিকল্পনার দাবিতে বহু ছাত্রাবাস নিশ্চিহ্ন হয়েছে এবং অনেক ছবি চুণের আস্তরের তলায় ঢাকা পড়েছে। ফোটোগ্রাফ নেবার কথাও সে সময় মনে হয় নি। কাজেই বর্ণনার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। বিষয়-নির্বাচন সম্বন্ধেই প্রথমে উল্লেখ করা দরকার। অনেক ক্ষেত্রে শিল্পীরা চোখের সামনে যা দেখেছেন সেটিকে দেওয়ালে রঙে রেখায় রূপায়িত করেছেন। এইভাবে একজন করলেন ছাত্রাবাসের পাশে শিমুল গাছ, আর-একজন দেখলেন সামনের রাস্তায় ইলেকট্রিক পোস্ট, ছাতা-হাতে একজন মানুষ, পারস্পেকটিভের কৌশল শিল্পীর

যতটা জানা ছিল সবই তিনি ছবিতে প্রবর্তনের চেষ্টা করলেন। এইভাবে প্রত্যেকে নিজের জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করলেন। ছাত্ররা কাজ নিয়ে ব্যস্ত রইলেন। রং তৈরি, বর্ণলেপন ইত্যাদি শিখলেন। নন্দলাল এইটিই লক্ষ্য করে খুশী হলেন। ছবি কোন্ জাতের হল, ভালো হল কি মন্দ হল, সে সম্বন্ধে তিনি কোনো মতামত প্রকাশ করলেন না।

মূর্তিকলাবিভাগ

কলাভবনের শিক্ষা কোনো নির্দিষ্ট সিলেবাস অনুসরণ করে চলে নি, পরিবর্তে সুযোগ-সুবিধামত বিভিন্ন রীতিপদ্ধতি. করণ-কৌশল প্রবর্তিত হয়েছে, তারই প্রমাণরূপে উল্লেখ করা চলে মূর্তিকলা-বিভাগের কথা। চিত্রকলার মতো মূর্তিকলার অনুশীলন শুরু হয়েছিল ব্রহ্মচর্যাশ্রমে কাশীনাথ দেবলের অধীনে। কলাভবনের প্রথম যুগে মহিলারা মাটির পুতুল ইত্যাদি নির্মাণ করেছিলেন কিন্তু স্থায়ী ছাত্রছাত্রীরা এ বিষয়ে চর্চা করেন নি। এই সময় নন্দলালের অতিথিরূপে শিল্পী দেবীপ্রসাদ শান্তিনিকেতনে আসেন এবং নন্দলালের অনুরোধে ছাত্রছাত্রীদের মূর্তি নির্মাণ সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দেন; এবং ল্যান্ট্রি (Lanteri) রচিত বিখ্যাত মডেলিংএর বইখানি ছাত্রদের দেখতে বলেন।

এর পর আসেন মিস পট নামে জনৈকা মহিলা শিল্পী। তিনি ছাত্রদের আর্মেচার তৈরি ও ছাঁচ নেওয়া সম্বন্ধে কিছু হাতে-কলমে শিক্ষা দেন। আরো কিছুকাল পরে বিখ্যাত ফরাসী শিল্পী বুর্দেলের সাক্ষাৎ শিষ্যা মিসেস মিলওয়ার্ড শান্তিনিকেতনে আসেন এবং কিছুকাল কাজ করেন। এই দুইজন শিল্পী কেউই কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিযুক্ত হন নি। তাঁদের কাজ দেখে এবং ল্যান্ট্রির পুস্তকের সাহায্যে মডেলিং-এর কাজ শুরু হয়। প্রতিকৃতি নির্মাণ ভারতীয় শিল্পীদের চর্চার বিষয় ছিল না। নন্দলাল এ বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করার চেষ্টাও করেন নি। মডেলিং বিভাগকে কেন্দ্র করে যখন প্রতিকৃতি-

নির্মাণ শুরু হয় তখন নন্দলাল আপত্তি করলেন না, বরং তিনি এই বিষয়টি চর্চার সুযোগ সুবিধা দিলেন।

এই বিভাগের প্রয়োজনীয় উপকরণ কিছুই তখন ছিল না। প্রথম দিকের শিল্পীরা জলচৌকির উপর মাটি রেখে কাজ করতেন, ক্রমে টার্ন-টেবিল ইত্যাদি উপকরণ তৈরি হয়। পশ্চিম তোরণের উপরতলায় এই বিভাগের কাজ প্রথম শুরু হয়। এই বিভাগের শিল্পীরা কোনোদিনই বিশেষজ্ঞের অধীনে কাজ করেন নি। নিজেদের চেষ্টায় এই বিভাগটি গড়ে উঠেছে।

কত বিভিন্ন ধারায় তখন কাজ চলেছিল তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে দেওয়া গেল। একই ঘরে উপবিষ্ট শিল্পীদের রচনাতে কোনো মিল ছিল না। কারণ চীন, তিব্বতী, দেশী এবং বাস্তবানুগত চিত্রের অনুশীলনের বাধা সে সময় ছিল না। আভাস-ইঙ্গিতে প্রগতিবাদী ফরাসী শিল্পের প্রভাবও এই সময় কোনো কোনো শিল্পীর রচনাতে দেখা দিয়েছে।

অন্য দিকে ছাত্রীরা অলংকরণ শিল্পচর্চায় রত। এরই সঙ্গে ছিল উড্‌কাট, লিথোগ্রাফ। অপর দিকে ছিল মডেলিং বিভাগ যেখানে পুরোপুরি পাশ্চাত্য রীতির চর্চা চলেছে। এই পরিবেশে নন্দলাল ছাত্রদের পাশাপাশি বসে নিজের কাজ করেছেন। তিন বছর ও পাঁচ বছরের শিক্ষাব্যবস্থা কাগজে-কলমে থাকলেও ছাত্রদের নন্দলাল সেভাবে চালিত করেন নি, পরিবর্তে ছাত্ররা চালিত হয়েছিলেন গবেষণাগারের কর্মীরূপে। এই অভাবনীয় পরিবেশ দেখে জনৈক শিল্পরসিক নন্দলালকে বলেন— এই যথেচ্ছাচার বন্ধ করা উচিত। ভারতীয় শিল্পের আদর্শ শিল্পীদের সামনে উপস্থিত করার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। জবাবে নন্দলাল বলেন— "এঁরা ছাত্র হলেও শিল্পী, তাঁদের সৃষ্টি কর্মে বাধা দেবার অধিকার আমার নেই। যা আমাদের নেই তা বাইরে থেকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।"

প্রথমেই লক্ষ্য করা যায় বিশ্বভারতীর শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আইনকানুন বয়স্ক ছাত্রদের ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিল হয়ে এসেছে। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যোগাযোগ পূর্বের তুলনায় কম। প্রত্যেক বিভাগ পূর্বের

তুলনায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। নূতন গৃহাদি নির্মিত হয়েছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে আশ্রমের জীবন পূর্বের তুলনায় কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়েছে। ঋতু-উৎসব, নাটক অভিনয় ইত্যাদির সাহায্যে যে পরিবেশ রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেছিলেন তা অক্ষুণ্ণ থাকলেও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আশ্রমবাসীর কাছ থেকে পূর্বের অপেক্ষা দূরে চলে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ছিল বিশ্বভারতী পরিচালনা প্রধানত অধ্যাপকরাই করবেন ; দপ্তরের প্রভাবকে তিনি শিক্ষার প্রতিকূল বলেই মনে করতেন। বিশ্বভারতীর কর্মজীবনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ হ্রাস পাবার মুহূর্তে পরিচালন বিভাগের প্রভাব স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়।

কলাভবন প্রতিষ্ঠার প্রথম পাঁচ বছরে যে শিক্ষানীতি প্রবর্তিত হয় এ পর্যন্ত তারই অনুসরণ হয়েছে। ইতিমধ্যে কিছু কিছু শিক্ষার বিষয় প্রবর্তিত ও লুপ্ত হয়েছে। তবে কলাভবনে যা অনুসৃত হয় সেটি তালিকাভুক্ত করলে এইরকম দাঁড়ায়— চিত্রকলা, ভিত্তিচিত্র, মূর্তিকলা, গ্রাফিক, নকশার কাজ ও কারুকলা। ইতিমধ্যে শিক্ষাপদ্ধতির ক্ষেত্রে নন্দলাল যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তারই অনুসরণ করা হয়েছে পরবর্তীকালে। মৌলিক রচনাকে কেন্দ্র করে শিক্ষাদান, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের পথে শিল্পীমনের বিকাশ, পরম্পরার পথে আঙ্গিকের উৎকর্ষ ইত্যাদি বিষয়ে নন্দলালের আদর্শের কোনো পরিবর্তন হয় নি। প্রথম দশ বৎসরের মধ্যে কলাভবনের পাঠ্যক্রম, শিক্ষাপদ্ধতি সম্পূর্ণ আকার নিয়েছিল।

১৯২৮-১৯২৯ সালের মধ্যে কলাবিভাগের নিজস্ব স্টুডিয়ো ইত্যাদি নির্মিত হয়। স্টুডিয়োর আদর্শ-অনুযায়ী ছাত্ররা এক এক শিক্ষকের অধীনে কাজ করতেন। এই পরিবেশে কলাভবনের পরবর্তী ইতিহাস (১৯৩০-৪০) আমরা আলোচনা করব।

কলাভবন প্রতিষ্ঠিত হবার কাল থেকে প্রয়োজনমত ছাত্ররাই নন্দলালের সহকারীরূপে কাজ করেছেন। কলাভবনের নূতন পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা যেমন বেড়েছে তেমনি অধ্যাপকের সংখ্যাও বাড়াতে হয়েছে।

এই সময় কলাভবনে যোগ দেবার জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষার সার্টিফিকেট

দেখাতে হত না ; অথবা পরীক্ষা করেও ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করা হত না। নন্দলাল ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের কাজ দেখে এবং তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে যোগ্যতা বিচার করতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যাঁরা কোথাও পূর্বে শেখেন নি তাঁদেরই তিনি উপযুক্ত বলে মনে করতেন।

কলাভবনে যোগ দেবার পর ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন শিক্ষকের অধীনে কাজ করতে হত। মৌলিক রচনা দিয়েই কাজ শুরু করার রীতি ছিল।

স্টুডিয়োর আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকায় ছাত্ররা যেমন স্বাধীনতা পেতেন তেমনি শিক্ষকদেরও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত রুচি-অনুযায়ী চালিত করার বিষয়ে নন্দলাল শিক্ষকদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, এবং কোনো কারণে অন্য শিক্ষকদের ব্যবস্থার উপর হস্তক্ষেপ করতেন না। অবশ্য সকল সময়েই ঘরোয়াভাবে ছাত্রদের বিষয় শিক্ষকদের সঙ্গে তিনি আলোচনা করতেন এবং প্রয়োজনমত পরামর্শ দিতেন ও গ্রহণ করতেন।

সকালে ছাত্রছাত্রীদের কাজ দেখানোর এবং অপরাহ্ণে শিক্ষকরা নিজের কাজ করার সময় পেয়েছিলেন। মাস্টারি করতে গিয়ে শিক্ষকদের কাজ বন্ধ না হয় এ বিষয়ে নন্দলাল অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তাঁর মতে 'যে শিক্ষক নিজের কাজ করতে ভুলেছে তাঁর কাছ থেকে ছাত্ররা কিছুই শিখবে না'।[১] শুধু তাই নয়, আরো স্পষ্ট ভাষায় তিনি সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন,…'যে সব শিল্পীর মৌলিক সৃষ্টির শক্তি বা অধিকার নেই, রসের প্রেরণা নেই, প্রায় দেখা যায়, তারা গুরুর কাছে যা শিক্ষা করেছে, বা কদাচিৎ নিজে নিজে যা উদ্ভাবন করেছে, তা সহজে অন্য কোনো জনকে শেখাতে চায় না; কৃপণের মতো গোপন করতেই সচেষ্ট হয়। শিল্পসৃষ্টির যথার্থ অধিকার না হওয়াতেই,… এ জাতীয় অনুদারতা ঘটে থাকে।' এই কারণে কলাভবনের ছোটো বড়ো পরিবর্তন যেমনই হোক-না কেন শিল্পের প্রাণবন্ত পরিবেশ নন্দলাল সজীব রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১ গ্রন্থকারের নিবেদন, শিল্পচর্চা, বিশ্বভারতী, বৈশাখ ১৩৬৩।

সকল শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার ভাব জাগিয়ে তোলার যে পথ নন্দলাল উদ্‌ভাবন করেছিলেন, সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা না হওয়া পর্যন্ত নন্দলালের শিক্ষানীতির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাবে না। এই কারণে তৎকালীন কলাভবনের শিক্ষাব্যবস্থা দৃষ্টান্তের সাহায্যে স্পষ্ট করে তোলার চেষ্টা করা গেল।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ছাত্রছাত্রীদের প্রথম পাঠ ছিল মৌলিক রচনা। মৌলিক রচনার সাহায্যে কিছুটা ধরা পড়ত ছাত্রের শিল্পীজনোচিত মনোভাব। সকল ছাত্রছাত্রীই যে মৌলিক রচনাতে উৎসাহিত হতেন তা নয়। যাঁরা মৌলিক রচনা করতে অনিচ্ছুক বা সে বিষয়ে অগ্রসর হতে পারতেন না তাঁদের নিয়েই ছিল সমস্যা। মৌলিক রচনার পরে ছাত্ররা যেতেন প্রকৃতি পর্যবেক্ষণে। বাইরে গিয়ে তাঁদের ইচ্ছামত স্কেচ করে আনতে হত। অনেক সময় দেখা যেত যে যে মৌলিক রচনায় অকৃতকার্য সে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণে অপেক্ষাকৃত আগ্রহশীল বা দক্ষ। ঠিক এর বিপরীত দৃষ্টান্তেরও অভাব ছিল না। ক্রমে মডেলিং এবং ডিজাইন ক্লাস শেষ হলে ছাত্রছাত্রীদের সম্বন্ধে অনেকটা সুস্পষ্ট ধারণা করতে পারতেন শিক্ষকরা। আঙ্গিকের ক্ষেত্রে নন্দলালের যে অসাধারণ দক্ষতা ছিল এ বিষয়ে মতভেদ থাকার কোনো কারণ নেই। কিন্তু মৌলিক সৃষ্টির ক্ষেত্রে আঙ্গিকের মূল্য কতখানি সে সম্বন্ধেও তাঁর নিঃসংশয় ধারণা ছিল। একবার জনৈক নতুন (beginner) ছাত্র নিজের আঙ্গিকগত দুর্বলতা সম্বন্ধে উপদেশ চায়। উত্তরে তিনি বলেন আঙ্গিক নিয়ে সমস্যা একেবারে সাধারণ (mediocre) শ্রেণীর শিল্পীর সমস্যা। সত্যকারের সৃষ্টিক্ষমতা যার আছে সে সামান্য ও সাধারণ আঙ্গিকের বলেই একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সঙ্গে একাসনে বসতে পারে। আঙ্গিকগত দক্ষতার অবশ্যই একান্তভাবে প্রয়োজন আছে তবে সেটুকুই সর্বস্ব নয়। সৃজনশীল শিল্পীর কাছে আঙ্গিক কখনোই বাধা হতে পারে না। তিনি সর্বদাই ছাত্রছাত্রীদের কাছে বলেছেন যে আঙ্গিক চরম সৃষ্টিশীলতার সহায়ক এ কথা তিনি আদপেই বিশ্বাস করেন না। আঙ্গিক হবে শিল্পীর অধীন, সে তার প্রভু নয়, এ কথা তিনি বারংবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

যে ক্ষেত্রে সকল বিষয়েই কোনো ছাত্র কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারতেন না সে ক্ষেত্রে নন্দলাল স্বয়ং অক্ষম ছাত্রদের নিজের অধীনে রাখতেন। বাইরে গিয়ে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের পথে আকার, ছন্দ, রেখা কিভাবে বুঝতে হয় তা তিনি এঁকে দেখাতেন বা লাইব্রেরিতে বসে দেশী ছবি দেখতে বলতেন। দৈবাৎ অনুলেখনের পাঠ দিতেন। এই অভ্যাসের পর আবার ছাত্র ফিরে আসতেন মৌলিক রচনার ক্ষেত্রে।

যে ক্ষেত্রে ছাত্রদের মধ্যে পাওয়া যেত স্বাভাবিক শিল্পপ্রবণতা সে ক্ষেত্রে ব্যবস্থা ছিল ভিন্ন রকমের। মৌলিক রচনা, প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ উভয়ক্ষেত্রেই যে ছাত্রের মননশীলতা ধরা পড়ত সে ক্ষেত্রে ছাত্র মৌলিক রচনা করার জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পেতেন। শিক্ষক মাত্রই সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন বলেই ধীরে ধীরে শিক্ষকদের ব্যক্তিগত রুচি মেজাজের প্রভাব কলাভবনে আত্মপ্রকাশ করে এবং পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে নন্দলালের তত্ত্বাবধানে চালিত কলাভবনের শিক্ষা বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়। এই বিচিত্র গতি নন্দলাল সযত্নে লালন করেছিলেন। বিভিন্ন ভাবধারাগুলির পরিচয় দিতে হলে প্রথমেই মডেলিং বিভাগের কথা বলতে হয়।

মৃৎশিল্প বিভাগ কিভাবে শুরু হয়েছিল সে বিষয়ে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। রামকিঙ্কর বেজ এ বিভাগের প্রথম ছাত্র এবং প্রথম স্থায়ী শিক্ষক। এ পর্যন্ত চিত্রকলা একটি পরম্পরার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে কলাভবনের মূর্তিকলার বিভাগ ভারতীয় আদর্শকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নি বলেই মূর্তিশিল্প পাশ্চাত্য পদ্ধতি ও করণ-কৌশলের সঙ্গে প্রথম থেকেই যুক্ত থেকেছে।

মডেলের সাহায্যে প্রতিকৃতি নির্মাণ এই বিভাগের অপরিহার্য অঙ্গ ছিল; যদিও অনুরূপ প্রয়াস চিত্ররচনার কালে অনুসৃত হয় নি।

যে সময় কলাভবনের ভাস্কর্যের চর্চা শুরু হয়েছে তখন ইয়োরোপের শিল্প-বাস্তবতার পথ ছেড়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে অনেক দূর এগিয়েছে। আধুনিক কালের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়াস কলাভবনের মূর্তি-শিল্পে প্রতিফলিত হবার পথে নন্দলাল উৎসাহ দিয়েছিলেন। ভারতীয়ত্বের দাবিতে বাধা উপস্থিত

করেন নি। সাধারণভাবে শিক্ষানীতি অটুট থাকলেও পরম্পরার ক্ষেত্রে ভাস্কর্য বিভাগে দেখা দিল ইয়োরোপের আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক শিল্পরূপ। এই প্রবণতাকে সংযত করার উদ্দেশ্যেই নন্দলাল 'কালো বাড়ি'র মূর্তিগুলি করার আয়োজন করেন।

চিত্রবিদ্যা শেখাবার কালে কোনো কোনো শিক্ষক ভারত-শিল্পের নিদর্শনের পাশে বিভিন্ন দেশের পরম্পরা সাজিয়ে শিল্পের নির্মাণ-রীতি, বর্ণোজ্জ্বলতা, রেখা-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ছাত্রদের সচেতন করার চেষ্টা করেন। এইভাবে চিত্র ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে পরম্পরা সম্বন্ধে নূতনতর চেতনা দেখা দেয়। নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও মৌলিক রচনা একই ধারায় প্রবাহিত হলেও পরম্পরা সম্বন্ধে ধারণার পরিবর্তন দেখা দেয়। এই পরিবর্তনটিকে কিছুটা নির্দিষ্ট করার জন্যই পরবর্তী কালে ভারতীয় চিত্রের অনুলেখন নন্দলাল আবশ্যিক করেন।

চিত্রে ও ভাস্কর্যে বিভিন্ন পরম্পরার প্রভাব প্রতিফলিত হবার যে সুযোগ ছিল, কারুকলা ও ডিজাইনের ক্ষেত্রে অনুরূপ সুযোগ আমরা লক্ষ্য করি না।

ডিজাইনের ক্ষেত্রে ভারতের অবদান যে অতুলনীয় এটি প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই। নন্দলালের এ বিষয়ে অসাধারণ প্রতিভা ও তাঁর সহকারিণী সুকুমারী দেবীর দক্ষতা এই বিভাগকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করেছিল। মৌলিক চিত্র রচনা অথবা মূর্তি নির্মাণের মতোই প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতাকে নক্‌শায় রূপান্তরিত করা এবং করণ-কৌশলের উপযুক্ত করে সেই নক্‌শার প্রবর্তন ছিল এই বিভাগের শিক্ষার লক্ষ্য। ১৯৩০-৩৫ সালের মধ্যে চামড়ার কাজ ও বাতিক কলাভবনে প্রবর্তিত হয়। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর চামড়ার কাজ শিখে আসেন ইয়োরোপ থেকে। বিষয়টি সম্বন্ধে তাঁর দক্ষতা ছিল যেমন অসাধারণ, তেমনি নিপুণতার সঙ্গে তিনি বিষয়টি তৎকালীন ইচ্ছুক শিল্পীদের শিখিয়েছিলেন। বাতিকের কাজ শেখার সুযোগ পাওয়া গেল প্রতিমা ঠাকুরের কাছ থেকে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যবদ্বীপ ভ্রমণের কালে প্রতিমা ঠাকুর বাতিকের কাজ দেখেন এবং কিছু বাতিকের কাপড় সংগ্রহ করে আনেন।[১]

এই সময়ের আর-একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা জাপানি রঙিন উড্ কাটের প্রবর্তন। শ্রীবিশ্বরূপ বসু জাপান থেকে রঙিন কাঠ-খোদাইএর কাজ শিখে আসেন। জাপানি রীতি-অনুযায়ী এই কাজ একাধিক কারিগরের সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়ে থাকে। শ্রীবিশ্বরূপ বসু সকল বিষয়েই অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেন, এবং কলাভবনে বিষয়টি প্রবর্তন করা হয় তাঁরই উৎসাহে। যে নূতন বিষয়গুলি প্রবর্তিত হল সে সম্বন্ধে ছাত্রশিক্ষক সকলেই কিছুটা তথ্য আহরণ করলেন, তবে চামড়ার কাজ ও বাতিক ছাত্রীদের শিক্ষার বিষয়ভুক্ত করা হয়। নন্দলালের নির্দেশমত বিশ্বরূপ কতকগুলি দেশী ছবির প্রতিলিপি প্রস্তুত করেন। ক্রমে রঙিন কাঠ-খোদাই কলাভবনে আবশ্যিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হয়।

কারুসংঘ

বিশেষ বিশেষ আদর্শকে কেন্দ্র করে শিল্পীগোষ্ঠী গড়ে ওঠার যে প্রবণতা ইয়োরোপীয় সমাজে লক্ষ্য করা যায় অনুরূপ লক্ষণ ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে অনেকদিন পর্যন্ত প্রকাশ পায় নি। ১৯২৭-১৯২৮ সালের কাছাকাছি রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব করেছিলেন যে শান্তিনিকেতনে যে-সব শিল্পী স্থায়ী ভাবে বাস করতে চায় তাদের কিছু জমি দেওয়া হোক। এই জমির আয় থেকে তাদের অর্থসমস্যা মিটবে। এই পরিকল্পনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। ১৯৩০ সালের পর

১ বাতিক সম্বন্ধে প্রতিমা দেবীর হাতে-কলমে কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। তবে ডাচ ভাষায় লেখা বাতিক সংক্রান্ত একটি প্রামাণ্য পুস্তকের অনুবাদ থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে অল্পদিনের মধ্যেই বাতিকের করণ-কৌশল আয়ত্তে আসে। শ্রীহীরেন্দ্রমোহন ঘোষ ও কলাভবনের অন্যান্য শিল্পীদের অকুণ্ঠ-প্রচেষ্টায় বাতিক সার্থকভাবে একটি কার্যকরী রূপ পায়। শ্রীহৈমন্তী চক্রবর্তী বাতিক সংক্রান্ত ডাচ গ্রন্থের অনুবাদ করে হীরেন ঘোষ মহাশয়কে সবিশেষ সাহায্য করেছিলেন। এই অনুবাদ-কর্মে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য আর দুজন হলেন সংগীতাচার্য আর্নল্ড বাকে ও শ্রীমতী বাকে। দুঃখের কথা অধিকাংশ অনুবাদেরই লিপিবদ্ধ কোনো নিদর্শন নেই।

নন্দলালের উৎসাহে ও প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় ও অর্থসাহায্যে কারুসংঘ নামে শিল্পীগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থির হয় যে ফ্রেস্কো, মূর্তি, কারুকলা ও অন্যান্য কাজের অর্ডার সংগ্রহ করা হবে। সেই অর্ডার প্রয়োজন অনুযায়ী শিল্পীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে এবং প্রত্যেক কাজের সঙ্গে কমিশন কেটে নিয়ে কারুসংঘের পুঁজি গড়ে উঠবে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কিছু জমি ক্রয় করা হয়। কারুসংঘের সভ্য যে-সব শিল্পী তাঁরা এই জমি যৎসামান্য মূল্যে ক্রয় করতে পারতেন। উপযুক্ত পরিচালকের অভাবে কারুসংঘ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি।

কারুসংঘের পরিকল্পনা অথবা রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত শিল্পীদের গ্রাম গড়ে না উঠলেও নন্দলাল অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে কলাভবনের জীবনযাত্রাকে একটি সংঘের আদর্শে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

স্টুডিয়োর কাজ, পিক্‌নিক, ৭ই পৌষের ছবি আঁকা, ভ্রমণ ইত্যাদির সঙ্গে ছাত্রাবাসের অবস্থা-ব্যবস্থা ও ছাত্রদের নানা ভাবে নানা কাজে উৎসাহিত করার যে প্রয়াস নন্দলাল সে সময় করেছিলেন তার প্রভাব কলাভবনের ইতিহাসে স্মরণীয়।

কেবল ছবি আঁকা নয় ছাত্রদের তিনি নানা রকম জনহিতকর কার্যে উৎসাহিত করেন। দূর পল্লীগ্রামে কোনো কারিগর গুরুতর অসুস্থ হওয়ায় নন্দলাল এক দল ছাত্রকে রোগীর পরিচর্যার জন্য পাঠিয়ে দেন। প্রায় দুই সপ্তাহ তাঁরা সেখানে রোগীর সেবা-যত্ন করেন। অনুরূপ পরিকল্পনা নন্দলাল একাধিকবার করেছেন। তবে তিনি সব সময় বলতেন— 'যে কাজই করো-না কেন, তুমি যে আর্টিস্ট সে কথা ভুলে যেও না।' নন্দলালের পরিচালনা আইন-উদ্‌ভাবনের পথে হয় নি। সকল শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে মেশবার অসাধারণ ক্ষমতা নন্দলালের চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য। এই কারণে তিনি কলাভবনের জীবনকে একটি সমগ্রতার ভাবে এবং এক মন্ত্রে বাঁধতে সক্ষম হয়েছিলেন।

নন্দলাল শান্তিনিকেতনে প্রথম যখন এসেছিলেন তখন তিনি ছিলেন

স্বল্পভাষী, গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। ছাত্রদের সঙ্গে কাজের কথা ছাড়া অন্য কথা অল্পই হত। ক্রমে তাঁর ব্যবহারে পরিবর্তন ঘটেছিল আশ্চর্যরকম। তাঁর সহজ সরল ব্যবহারে ছাত্র ও শিক্ষক, অধীনস্থ কর্মচারী সকলেই আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁকে শ্রদ্ধা করতে ও ভালোবাসতে পেরেছিলেন।

প্রথম দশ বৎসরের অভিজ্ঞতার সাহায্যে নন্দলাল যেমন কলাভবনের জীবনযাত্রাকে সুনির্দিষ্ট পথে চালিত করতে সক্ষম হলেন অপর দিকে কলা-ভবনের শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে কতকগুলি ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে তিনি কিঞ্চিৎ সচেতন হলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন স্টুডিয়োর আদর্শে যেভাবে শিক্ষা দেওয়া চলেছে তার দ্বারা লাভ যেমন হয়েছে লোকসানও কিছু কিছু হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এমন অনেক ছাত্রছাত্রী কলাভবন থেকে বেরিয়ে গেলেন যাঁরা সব বিষয়ে যথার্থ অনুশীলন করেন নি। যথা ছাত্রীদের অনেকেই বাইরে গিয়ে স্কেচ্ ইত্যাদি উপযুক্ত ভাবে অনুশীলন করেন নি। অপর দিকে ডিজাইনের কাজ সম্বন্ধে ছাত্রদের আগ্রহ কম। মৌলিক রচনার ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট পরম্পরা অনুসরণের চেষ্টা নেই। ভারতীয় পরম্পরার প্রভাব তুলনায় কম।

তিনি আরো লক্ষ্য করলেন প্রথম যুগের ছাত্ররা বাইরে গিয়ে বিভিন্ন পথে চলেছে। Oil painting, ইমপ্রেশ্নিজমের ভাবভঙ্গি এই-সব শিল্পীদের রচনার অন্যতম উপাদানে পরিণত হয়েছে। বিশৃঙ্খলতার সম্ভাবনায় নন্দলাল উদ্‌বিগ্ন হলেন। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষে নন্দলাল শিক্ষাপদ্ধতিকে অপেক্ষাকৃত নির্দিষ্ট ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করবার পরিকল্পনা করলেন ১৯৩০-১৯৩৫ সালের মধ্যে।

প্রসঙ্গক্রমে এ কথা আমরা উল্লেখ করেছি যে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মবোধ নন্দলালের শিক্ষার মেরুদণ্ড-স্বরূপ। প্রকৃতিজাত উদ্দীপনা থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়ার জন্য নন্দলালের বিভিন্ন প্রয়াস সম্বন্ধেও আমরা উল্লেখ করেছি। মেয়ে বোর্ডিং-এর নূতন আইনকানুনের প্রভাবে ছাত্রীরা যে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের সুযোগ-সুবিধা ছাত্রদের মতো পাচ্ছেন না এই বিষয়ে নন্দলাল যখন সচেতন হলেন তখন তিনি ছোটো ছোটো পিক্‌নিকের প্রবর্তন করলেন। পিকনিকে রান্না-খাওয়ার সঙ্গে স্কেচ্ করা, গ্রামের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করা ইত্যাদি

যেমন হল তেমনি অপেক্ষাকৃত নির্জন স্থানে পিকনিকের ব্যবস্থা তিনি করলেন। উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃতিকে ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ দেওয়া। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা দরকার যে প্রথম যুগের ছাত্ররা যেভাবে একই বিষয়কে কেন্দ্র করে দিন-রাত্রি পর্যবেক্ষণ করতেন অনুরূপ অনুশীলনের সুযোগ সুবিধা বা সেই মনোভাব এই সময়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দৈবাৎ লক্ষ্য করা যায়।

এই সময় নন্দলাল স্টুডিয়োর কাজের মধ্যেও প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রবর্তনের এক অভিনব উপায় উদ্‌ভাবন করলেন। ছাত্রছাত্রীরা মৌলিক রচনাতে নিমগ্ন, নন্দলাল অতর্কিতে ঘরে ঢুকে বিশেষ বিশেষ ছাত্রছাত্রীদের ছবির পাশে উজ্জ্বল রঙের ফুল, কচি বা শুকনো পাতা, ঘাসের ফলা রেখে দিয়ে চলে যেতেন। উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীরা এই আকস্মিক পরিবর্তনের প্রভাব লক্ষ্য করবে এবং রং ও রেখার তাজাভাব সম্বন্ধে সচেতন হবে। তাঁরই উদ্‌ভাবনের সাহায্যে ছাত্রছাত্রীরা যেমন উপকৃত হয়েছিলেন তেমনি শিক্ষকরাও তাঁর এই নীতি অনেক ক্ষেত্রে অনুসরণ করেছিলেন।

১৯৩৫ - ৪০

এই সময় বাস্তব উদ্দীপনা, ফরাসী-মার্কা আধুনিক শিল্পের বিভিন্ন উপাদান মণ্ডনরীতি, অলংকরণ শিল্প এই বিভিন্ন ধারার সাক্ষাৎ সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। ছাত্রীদের উপর নন্দলালের সহকারীদের প্রভাব ছিল যৎকিঞ্চিৎ। কারণ শুরু থেকেই নন্দলালের অধীনে বিশেষভাবে ছাত্রীরা কাজ করেছিলেন। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ বা ভারতীয় পরম্পরার অনুশীলন সম্বন্ধে নন্দলাল ও তাঁর সহকারীদের মধ্যে কোনোদিনই মতভেদ ঘটে নি। একমাত্র মৌলিক রচনার ক্ষেত্রে তাঁর সহকারীদের প্রভাব স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছিল, এবং সেই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল ছাত্রদের রচনাতে। এই অসামঞ্জস্যকে সামঞ্জস্যের দিকে চালিত করার জন্য নন্দলাল ধীরে ধীরে অনু-লেখনের প্রবর্তন করলেন তবে বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা হল না। তুলির

কাজ অধিকাংশ সময় ছাত্রছাত্রীরা নন্দলালের অধীনে অভ্যাস করতেন। রেখার সাবলীলতা দৃঢ়তা অনুলেখনের সাহায্যে আয়ত্ত করার নির্দেশ এই সময়ে তিনি দিয়েছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত ওয়াশ-পদ্ধতির অনুশীলন কলাভবনে কোনোদিনই প্রধান হয়ে ওঠে নি। আকার ও রেখা -যুক্ত শিল্পরূপ-নির্মাণের পথে টেম্পারা-পদ্ধতি কলাভবনে প্রধান অনুশীলনের বিষয় হয়ে উঠেছিল। ১৯৩৫ সালের পর ওয়াশ-পদ্ধতি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে আসে।

ওয়াসলি তৈরি, বর্ণের মিশ্রণ, বর্ণলেপন এইগুলি শিল্পচর্চার অপরিহার্য অঙ্গ করে তুললেন নন্দলাল। এই অনুশীলনের আদর্শরূপে অনুলেখনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে নন্দলাল ছাত্র ও শিক্ষকদের সচেতন করার চেষ্টা করেন। বর্ণ রেখা ও ভারতীয় করণ-কৌশল— এই তিনের সংযোগে শিল্পশিক্ষাকে সুনির্দিষ্ট পথে নিয়ন্ত্রিত করার প্রথম প্রচেষ্টা দেখা যায় ১৯৩৫ সালের পর।

এই সময় নন্দলাল কয়েকখানি পাখির ছবি তাঁর পরিচিত এক ডিলারের কাছ থেকে ক্রয় করেন। "লক্ষ্ণৌ বার্ড" নামে পরিচিত এই ছবিগুলি কলাভবনে দীর্ঘকাল অনুলেখনের প্রাথমিক পাঠরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। ইতিপূর্বে শিক্ষক বা ছাত্রদের রুচি মাফিক ও প্রয়োজন-অনুযায়ী অনুলেখনের পাঠ দেওয়া হত। ক্রমে লক্ষ্ণৌ পাখি ও রূপাবলীর ড্রইংগুলি অনুলেখনের জন্য আবশ্যিক করা হয়।

প্রাথমিক পাঠের ক্ষেত্রে এই-সব পরিবর্তন সক্রিয় হলেও অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষানীতির কোনোই পরিবর্তন নন্দলাল করলেন না। বিভিন্ন শিক্ষকের মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের চক্রবৎ গতি ও শিক্ষকদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রইল।

সহকারীরা যে-সকল বিষয়ে নন্দলালের সমর্থন পাচ্ছেন না, সে সকল বিষয়ে নন্দলালের মনোভাব আলাপ-আলোচনার সাহায্যে ক্রমে প্রকাশ পেল। বিদ্যালয়ের নিয়ম-অনুযায়ী সকাল নয়টার সময় সকলে কিছু সময়ের জন্য অবসর পেতেন। এই অবসরকালে নন্দলাল ও তাঁর সহকারীরা একত্রে বসতেন, চা খেতেন এবং কলাভবন ও সমকালীন শিল্পের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা

করতেন। তকমা-মারা মিটিং না হলেও এই সময়টি Board of Studies-এর স্থান পূরণ করেছিল। এই-সব আলোচনার মাধ্যমে নন্দলাল ও তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে সন্দেহ ও সমস্যার কুয়াশা দূর হয়ে যেত।

গান্ধীজি ও নন্দলাল

রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত বিশ্বভারতীর আদর্শ ও গান্ধীজির অসহযোগ-আন্দোলন একই সময় আত্মপ্রকাশ করেছিল। যে কজন কর্মী রবীন্দ্রনাথের আওতায় থেকেও গান্ধীজির আদর্শকে অনুসরণের চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে নন্দলাল অন্যতম। নন্দলাল এক সময় কলাভবনের ছাত্র ও শিক্ষকদের নিয়ে চরকা কাটার পরিকল্পনা করেন। সেই পরিকল্পনা স্থায়ী না হলেও নন্দলাল স্বয়ং দীর্ঘকাল তকলি কেটেছিলেন। তাঁর অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত গান্ধী দিবসে[১] ছাত্রদের নিয়ে সাফাইএর কাজও করেছেন।

জাতীয়তাবাদী নন্দলাল গান্ধীজির অসহযোগ-আন্দোলনের যে মূল্য দিয়েছিলেন অনুরূপভাবে তাঁর অহিংসনীতিকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেন নি। শান্তিনিকেতনে যতদূর সম্ভব গান্ধীজির আদর্শকে তিনি ছাত্র ও বন্ধু -মহলে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন।

নন্দলাল শিল্পী। শিল্পের পথ ছেড়ে অন্য কোনো পথ গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই কারণে তিনি বারংবার অনুসন্ধান করেছিলেন শিল্পকলা সম্বন্ধে গান্ধীজির মতামত। বলা বাহুল্য দীর্ঘকাল পর্যন্ত শিল্পীরূপে গান্ধীজিকে অনুসরণ করার উপযুক্ত পথ তিনি খুঁজে পান নি। বরং অনেক ক্ষেত্রে গান্ধীজির শিল্পবিষয়ক মতবাদ সম্পর্কে তাঁর মনে গভীর সন্দেহ জেগেছিল। এই অবস্থার মধ্যে অকস্মাৎ একদিন গান্ধীজি নন্দলালকে আহ্বান করলেন কংগ্রেসের প্রদর্শনী ও মণ্ডপ-সজ্জার ভার গ্রহণের জন্য। অহিংসবাদকে তিনি স্বীকার না করলেও গান্ধীজির নেতৃত্বকে তিনি মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন।

---

১ ১৯১৫ সালের পর থেকে প্রতি ১০ই মার্চ শান্তিনিকেতনে গান্ধী-পুণ্যাহ দিবস পালন করা হয়।

এ পর্যন্ত কংগ্রেস একান্তভাবে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও রাজনীতিজ্ঞদের মেলামেশার স্থান ছিল। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কংগ্রেসের কোনো উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনা পাওয়া যায় না। গান্ধীজির মধ্যস্থতায় শিল্পীসমাজের সঙ্গে রাজনীতিজ্ঞদের যোগাযোগের পথ মুক্ত হল। নন্দলাল হলেন যোগসূত্র স্থাপনের প্রধান ও প্রথম প্রতিনিধি।

লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস উপলক্ষে নন্দলাল একটি ভারতীয় শিল্পের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন (retrospective) এবং শিল্পী যামিনী রায়কে মণ্ডপ-সজ্জার জন্য কতকগুলি চিত্র রচনার ভার দেন। ইতিপূর্বে কংগ্রেসের অনুরূপ শিল্পপ্রদর্শনী হয় নি। বিভিন্ন মিউজিয়ম ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে প্রায় পাঁচশত ছবির সাহায্যে ভারতীয় শিল্পের বিবর্তন জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করাই ছিল এই প্রদর্শনীর লক্ষ্য (এপ্রিল ১৯৩৬)।

লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের পর গান্ধীজি স্থির করেন যে কংগ্রেস সভা গ্রামের সঙ্গে যুক্ত হওয়া প্রয়োজন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ফৈজপুর (ডিসেম্বর ১৯৩৬) কংগ্রেস শুরু হয়। ফৈজপুর কংগ্রেসের কালে গান্ধীজি নন্দলালকে মণ্ডপ-সজ্জার সম্পূর্ণ ভার দেন এবং স্পষ্টভাবে নন্দলালের কাছে তাঁর দাবি উপস্থিত করেন। গান্ধীজি বলেন যে প্রচুর অর্থব্যয় করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। গ্রামের উৎপন্ন জিনিসের সাহায্যে কংগ্রেস-নগরের সজ্জা নন্দলালকে করতে হবে। এ পর্যন্ত ঠিকাদারদের সাহায্যে কংগ্রেসের তোরণ ইত্যাদি তৈরি হয়ে এসেছে। সম্পূর্ণভাবে এই দায়িত্ব কোনো শিল্পীর হাতে ইতিপূর্বে দেওয়া হয় নি।

দেশের মাটির সঙ্গে নন্দলালের যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। গ্রামের পরিবেশ অথবা গ্রাম্য কারিগরদের অবদান সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। এই কারণে ফৈজপুর কংগ্রেস সজ্জার পরিকল্পনা স্থানীয় উৎপন্ন জিনিসের সাহায্যে অনায়াসে সজ্জিত করতে তিনি সক্ষম হন। তাঁর শিল্পবোধের বিশেষ পরিচয় এই সময় তিনি বৃহত্তর সমাজের সামনে উপস্থিত করতে সক্ষম হলেন। অপর দিকে গান্ধীজি ও বিভিন্ন নেতাদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সূচনা হয় এই সময় থেকে।

হরিপুরা কংগ্রেস (১৯৩৮) নন্দলালের অন্যতম কীর্তি। হরিপুরা কংগ্রেসের বিরাট পরিকল্পনা নন্দলাল তাঁর ছাত্রদের সাহায্যে সম্পন্ন করেন। এই মণ্ডপ-সজ্জার আদর্শ পরবর্তী কালের কংগ্রেস ও অন্যান্য জাতীয় অনুষ্ঠানের সজ্জার আদর্শরূপে গৃহীত হয়। নন্দলাল ও তাঁর সহকারীদের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা অপর দিকে সর্বসাধারণের সঙ্গে অনায়াসে মিলবার শক্তি এবং নন্দলালের কর্মক্ষমতা যুগপৎ তৎকালীন নেতাদের মনে শিল্পীদের সম্বন্ধে নূতন চেতনা জাগিয়েছিল। তাঁরা অনুভব করলেন যে শিল্পীরা শৌখিন সমাজের প্রতিনিধি নয়, তাঁরা কর্মী। জাতীয় জীবনে তাঁদের অবদান উপেক্ষা করা চলে না। গান্ধীজি নন্দলালের মতো প্রতিভাবান শিল্পীকে দড়ি-দড়া বাঁধার কাজে নিযুক্ত করেছেন— এই ধারণায় কোনো কোনো শিল্পরসিক ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু নন্দলালের মনে এ বিষয়ে কোনো ক্ষোভ ছিল না। শিল্পীরা দেশের কাজে হাত লাগাতে পারল এবং বৃহৎ জনতার সামনে শিল্পের সম্ভার উপস্থিত করা গেল— এই দিক দিয়ে নন্দলাল গান্ধীজির দাবি পূরণ করেছিলেন।

ক্রমে গান্ধীজি-প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনার কালে শিল্পের পাঠ্যক্রম নন্দলালের দ্বারাই রচিত হয়। এই পাঠ্যক্রম অনুসরণ করলে দেখা যাবে যে নন্দলাল কলাভবনে শিক্ষাদানের যে পরিকল্পনা করেছিলেন তারই সার-সংকলন হয়েছে বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠ্যক্রমে।

শান্তিনিকেতনে যে সময়ে নূতন দালান-বাড়ি তৈরি হয়ে চলেছে, সেই সময়ে নন্দলাল অল্পব্যয়ে মাটির বাড়ি করার পরিকল্পনা করেন। মাটির বাড়িতে আল্‌কাতরার লেপ দিয়ে জল-প্রতিরোধক চৈত্যগৃহটি নন্দলালের প্রথম স্থাপত্য। এই স্থাপত্য ছাত্রছাত্রীরা নিজহাতে তৈরি করেছিলেন। এই সঙ্গে বিরাট আকারের বুদ্ধমূর্তিও নির্মিত হয়। সম্ভবত নালন্দার মৃৎশিল্প দেখে নন্দলাল মাটির মূর্তি ও মাটির ঘর তৈরির পরিকল্পনা করেন। ক্রমে 'কালো বাড়ি' নামে পরিচিত কলাভবনের ছাত্রাবাস ও রবীন্দ্রনাথের বাসস্থান 'শ্যামলী' এইভাবে নির্মিত হয়। স্থানীয় উৎপন্ন বস্তুর সাহায্যে অল্পব্যয়ে

গৃহনির্মাণের পরিকল্পনা নন্দলাল করেছিলেন গান্ধীজির সংস্পর্শে আসার পূর্বে। গান্ধীজির কাছে নন্দলালের এই পরিকল্পনার খবর পৌঁচেছিল কি না সে বিষয় নির্ভুল খবর পাওয়া না গেলেও গান্ধীজির সহকারী ডক্টর জে. সি. কুমারাপ্পা শান্তিনিকেতন পরিদর্শনের কালে এই বাড়িগুলির নির্মাণ-রীতি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করেছিলেন এবং ওয়ার্ধাতে অনুরূপ গৃহাদি নির্মাণ করা সম্ভব কি না সে বিষয়ে নন্দলালের সঙ্গে আলোচনা করেন। গান্ধীজি প্রসঙ্গে নন্দলালের পরিকল্পিত এই গৃহগুলির উল্লেখ করার প্রয়োজন হল কারণ গান্ধীজি নন্দলালকে প্রধানত কর্মীরূপে দেখেছিলেন। সম্ভবত গান্ধীজি শিল্পী-সমাজে অনুরূপ কর্মীর সন্ধান পান নি। এই কারণে তিনি নন্দলালকে তাঁর অন্যতম সহকর্মী ও ভারতের নব্য শিল্পীসমাজের সর্বপ্রধান প্রতিনিধি-রূপে দেশের সামনে উপস্থিত করেছিলেন।

গান্ধীজির সংস্পর্শে নন্দলালের জাতীয়তাবোধ নূতন করে আত্মপ্রকাশ করে এবং কলাভবনের শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব আমরা লক্ষ্য করি। দেশী কাগজ, দেশী রং, দেশের ঐতিহ্য যুগপৎ শিল্পে প্রকাশিত করার চেষ্টা নন্দলাল সকল সময়েই করেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এই চেষ্টা অনেক পরিমাণে সক্রিয়। নিজহাতে রং তৈরি সম্বন্ধে নন্দলাল ছাত্রদের উৎসাহিত করতেন। জনৈক ছাত্রীকে জৈন শাস্ত্র থেকে বর্ণ প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে তথ্য আহরণ ও রং প্রস্তুত করতে উৎসাহিত করেন। বাতিক রং করার জন্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়-সম্পাদিত দেশী রঙের সূত্র অনুযায়ী কাপড় ছাপানোর চেষ্টাও তিনি করেছিলেন। অসহযোগ-আন্দোলনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তিনি শিল্পীদের সকল প্রয়োজনীয় বস্তু নিজহাতে তৈরি করে নেবার পথ অনুসন্ধান করেন সকল ক্ষেত্রে তিনি কৃতকার্য না হলেও তার প্রভাব শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক পরিমাণে সক্রিয় হয়েছে।

দেশী রং, কাগজ, পরম্পরার ক্ষেত্রে জাতীয় আভিজাত্য থাকলেও নন্দলালের শিক্ষা বৃহত্তর শিল্পপরম্পরা সম্বন্ধে তখনও যথেষ্ট সচেতন। অ্যানাটমি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং রীতিমত অ্যানাটমির চর্চা ছাত্রদের মধ্যে তিনি প্রবর্তিত

করেন এবং নিজেও এ বিষয়ে নূতন করে চর্চা শুরু করেন। ডাক্তারের[১] সহায়তায় বিজ্ঞান-সম্মতভাবে ও যত্নের সঙ্গে শারীর-সংস্থান বিদ্যা (Anatomy) শিক্ষণের ব্যবস্থা কলাভবনে থাকলেও শিক্ষণ-আদর্শ যেভাবে অগ্রসর হয়েছে তার দুটি দিক আছে।

একটি হল আশ্রমের নাটক অভিনয়ের পটভূমিতে বিদগ্ধ পুরুষ-রমণীর বস্ত্রাচ্ছাদিত, নৃত্যরত গতিশীল দেহভঙ্গিমার প্রভাব, অপরটি হল নিরন্তর কর্মরত অর্ধনগ্ন সাঁওতাল ও গ্রামবাসীদের দৈহিক গতিময়তার প্রভাব। শারীর-সংস্থান বিদ্যার অনুশীলন জীবন থেকে বিচ্যুত না হওয়ার কারণে এবং জীবনের সঙ্গে তার নিরন্তর প্রয়োগের ফলে কলাভবনের ছাত্রছাত্রীরা ড্রয়িঙে গতি ভাবাবেগ সংযোজনায় যে দক্ষতা ও সফলতা অর্জন করেছিলেন এমন তৎকালীন কোনো আর্টস্কুলেই দেখা যায় নি।

এই অভিজ্ঞতারই প্রত্যক্ষ প্রকাশ অর্জুনের ছবি। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেলো, ডুরার ইত্যাদি শিল্পীদের তিনি অনুশীলন করেন এবং প্রয়োজনমত ছাত্রদের এই ড্রয়িঙের অনুলেখন করতে উৎসাহিত করেন। চিত্ররচনা বা প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের কালে ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের জন্য পাশ্চাত্য বা প্রাচ্য শিল্পসংস্কৃতি থেকে অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা সকল সময়েই তিনি অনুভব করেছিলেন।

আধুনিক শিল্পের পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিশেষভাবে কিউবিজম ও বিমূর্তবাদ সম্বন্ধে নন্দলালের মনে সন্দেহ ছিল যথেষ্ট। সাদৃশ্যবর্জিত শিল্পরূপ সম্পর্কে নন্দলালের মনে নিরন্তর একটি সংশয়ের দোলা লক্ষ্য করা যায়। এই কারণে তাঁর সহকারীদের মধ্যে যখন বিমূর্ত শিল্পের চর্চা দেখা দিল তখন এই জাতীয় অনুশীলনকে নন্দলাল অনুকরণধর্মী শিল্পের মতোই দূরে রাখবার চেষ্টা করেন। তাঁর মতে নিরঙ্কুশ প্রকৃতি বা নিরঙ্কুশ জ্যামিতি এই দুই চরম সীমায় সার্থক শিল্পরূপ আত্মপ্রকাশ করে না। অবশ্য নন্দলাল এই

১ তৎকালীন চীফ মেডিক্যাল অফিসার ছিলেন ডাক্তার জ্যোৎস্না সেন।

জাতীয় শিল্পসৃষ্টির কালে শিল্পীর সামনে কোনো বাধা উপস্থিত করেন নি। রামকিঙ্কর-নির্মিত মূর্তিগুলি নন্দলালের উদার শিল্পদৃষ্টির স্বাক্ষর।

১৯৪০-১৯৫০

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার প্রথম দশ বছর যেমন নানা দিক দিয়ে স্মরণীয় তারই সঙ্গে তুলনীয় ১৯৪০ থেকে ১৯৫০ সালের ইতিহাস। এই কারণে সাধারণভাবে দু-চার কথা বলে নেওয়া দরকার। রবীন্দ্রনাথ-পরিকল্পিত বিশ্বভারতীর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ বহু পরিবর্তন ঘটেছে ইতিমধ্যে। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আদর্শ অনুযায়ী কলেজ স্থাপিত হওয়ার মুহূর্ত থেকে দুটি ভিন্ন-মুখী আদর্শের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়।

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন সৃষ্টির পথে মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। সাহিত্য, সংগীত, শিল্পকলা ও নানা উৎসব ছিল এই শিক্ষার অন্যতম ধারক ও বাহক। পরীক্ষার ফলাফলের উপর তিনি আস্থা রাখতেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা যে এই আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত সে বিষয়ে নূতন করে বলার প্রয়োজন নেই। পরিচালক বিভাগের পক্ষে কলেজের বাঁধা-ধরা শিক্ষাকে চালিত করা যত সহজ, রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত শিক্ষাকে সেভাবে চালিত করা সম্ভব নয়। এই কারণে পরিচালকবর্গের প্রভাবে ক্রমেই কলেজের আধিপত্য বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত শিক্ষাদর্শের প্রভাব ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসে। এই সময় রবীন্দ্রনাথ এমনই অসুস্থ ছিলেন যে বিশ্বভারতীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। ১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে বিশ্বভারতীর আভ্যন্তরীণ অবস্থার বড়ো রকমের কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। কেবল কলেজের আধিপত্য অধিকতর শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে একমাত্র নন্দলাল কলাভবনের জীবনযাত্রাকে অটুট রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকে নন্দলালকে কলাভবন পরিচালনা সম্বন্ধে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। এই কারণে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ নন্দলালের কার্যপ্রণালীতে হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম হন নি। অপর দিকে নন্দলালের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা

তখন মধ্যগগনে, গান্ধীজির সান্নিধ্যে তিনি তখন ভারতীয় শিল্পীসমাজের সর্বপ্রধান প্রতিনিধি।

শিক্ষক ছাত্র ও শিক্ষা-ব্যবস্থা এই তিনের সংযোগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সার্থকতা। কলাভবনের শিক্ষক ও শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে, এবার ছাত্রদের সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। কলাভবনের প্রথম পর্বে ছাত্রছাত্রীসংখ্যা অল্প থাকায় প্রত্যেকের কাজকর্মের প্রতি লক্ষ রাখা ও বিভিন্ন প্রকৃতির ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্ত করে শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করা সহজসাধ্য ছিল। ক্রমে শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এইভাবে শিক্ষা দেওয়ার পথে এক নূতন সমস্যার সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন প্রদেশের ছাত্রছাত্রীদের মতি-মেজাজ শিক্ষা-দীক্ষা এবং শৈশবের পরিবেশ ও শিল্পপ্রবণতা এক রকম না হওয়ায় সমস্যা জটিলতর হয়ে ওঠে। যে ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম অনুসরণ করাই শিক্ষকদের একমাত্র দায়িত্ব থাকে সে ক্ষেত্রে সমস্যা কম। কারণ ছাত্রদের সমস্যা স্বতন্ত্রভাবে সমাধানের প্রয়োজন হয় না। নন্দলালের আদর্শ ব্যক্তিকেন্দ্রিক। এই কারণে শিক্ষার বিষয় এক থাকলেও শিক্ষাপদ্ধতি হুবহু এক থাকে নি।

বহু ছাত্রছাত্রীর উপযুক্ত করে কলাভবনের শিক্ষাব্যবস্থাকে সুনির্দিষ্ট পথে চালিত করার ইচ্ছা ১৯৩৫ সালের পর তাঁর মনে জাগে এবং ১৯৪০ সালের প্রাক্‌কালে শিক্ষার বিষয়গুলিকে সুনির্দিষ্ট করে তোলার চেষ্টা শুরু হয়। ইতিপূর্বে নন্দলালের সহকারীদের সংখ্যা অল্প ছিল। অধ্যাপক পাঁচজন এবং অধ্যাপিকা দুইজন। ছাত্রছাত্রীরা চক্রবৎ গতিতে সকল শিক্ষকের নিকট শিক্ষা করতে পারেন— এই ব্যবস্থা অটুট রইল, তবে স্থিতি-কালের পরিবর্তন ঘটল। গত দশ বছরের ব্যবস্থা অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীরা একই শিক্ষকের কাছে অনির্দিষ্ট কাল কাজ করতে পারতেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই শিক্ষকের কাছে দুই বা ততোধিক বছর ছাত্রছাত্রীরা কাজ করেছেন। নূতন ব্যবস্থা অনুযায়ী স্থিতিকাল নির্দিষ্ট হয় পনেরো দিন থেকে এক মাস। এই ঘূর্ণন গতি প্রবর্তনের ফলে ছাত্রীরা প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি কাজে পূর্বের অপেক্ষা অধিক সময় দিতে বাধ্য হলেন। অপর দিকে ছাত্রদের কারুকর্মের শিক্ষা অংশত বাধ্যতামূলক

হয়। দেশী পরম্পরা ও হাতের দক্ষতা অর্জনের জন্য অনুলেখনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় এবং মৌলিক রচনার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা থাকলেও কতকগুলি বিষয় নির্দিষ্ট করে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। যথা দৃশ্য, জীব-জন্তু, দৈনন্দিন জীবন পৌরাণিক কাহিনী ইত্যাদি।

প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের বিষয় নির্দিষ্ট করার ব্যবস্থাও এই সময় থেকে। বিভিন্ন ঋতুর ফুল, স্থানীয় গাছ ও গৃহপালিত জন্তু এবং কর্মরত নরনারী প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শিক্ষকরা লক্ষ রাখতেন ছাত্রছাত্রীদের প্রবণতার দিকে। যে-সব শিক্ষার্থীর বাস্তবতার দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক ছিল তাঁদের দুই আয়তনযুক্ত দেশী ছবির অনুলেখনের দিকে চালিত করা হত। অপর দিকে যে-সব শিক্ষার্থী অতিরিক্ত কল্পনাপ্রবণ, ভাবালুতা যাঁদের মৌলিক রচনাকে সংকীর্ণ করত তাঁদের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হত।

শিক্ষকদের দায়িত্ব সম্বন্ধে আরো দু-চার কথা বলা দরকার। অভিজ্ঞ শিক্ষকদের হাতে মৌলিক রচনা ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের কাজ অর্পণ করা হয়। অনুলেখনের পাঠ দিতেন নব-নিযুক্ত শিক্ষকরা। হাতের কাজ, আলপনা ইত্যাদি পূর্বের মতো নন্দলাল ব্যক্তিগতভাবে পরিচালনা করতেন। কোন্ ছাত্রকে কিভাবে চালিত করা উচিত, কোন্ বিষয়ে ছাত্রের দুর্বলতা সে সম্বন্ধে শিক্ষকরা নন্দলালকে জানাতেন অথবা নন্দলাল এ বিষয়ে শিক্ষকদের সচেতন করে দিতেন। এই ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য নন্দলাল এক সময় ছাপা form-এর প্রবর্তন করেন। এই ছাপা কাগজে ছাত্রদের নাম, শিখবার বিষয় নন্দলাল লিখে দিতেন। ছাত্রদের কাজ শেষ হবার পর শিক্ষকরা নিজেদের মন্তব্যগুলি ফর্মে (form) লিখে দিতেন। নোটিস ছাপা, ফর্ম ইত্যাদি নন্দলাল পছন্দ করতেন না বলেই ফর্মের ব্যবস্থা অল্পকালের মধ্যে বন্ধ হয় এবং পূর্বের মতো মৌখিক আলাপ-আলোচনার সাহায্যে এই কাজ সম্পন্ন হয়। নন্দলাল স্টুডিয়োতে বসে একটানা ভাবে কাজ করার বিরোধী ছিলেন। তিনি বলতেন— 'বুঁদ হয়ে ঘরে বসে থাকলেই আর্টিস্ট হয় না, বাইরের দিকে দেখতে হয় ভাবতে হয় এবং

অনুভব করার উপযুক্ত অবসরের প্রয়োজন হয়।' এই প্রসঙ্গে একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করা গেল। জনৈক গুজরাটী ছাত্রী অসাধারণ পরিশ্রমী ছিলেন। নন্দলাল তাঁকে এক সপ্তাহের জন্য সকল রকমের কাজ বন্ধ করে দেন। তিনি তাঁকে বলেন যে কিছু কাজ না করে তুমি কেমন থাক আমাকে জানাবে। প্রথমে ছাত্রী অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন হন, কারণ ছবি আঁকা, স্কেচ্‌ করা, লাইব্রেরিতে বসে ছবির বই দেখা বা পড়া কিছুই করা যাবে না। ছাত্রী বারে বারে নন্দলালের কাছে আসেন একটা কিছু করবার অনুমতি যদি পাওয়া যায়— এই আশায়। নন্দলাল তাঁর সঙ্গে গল্প করেন, হাসি তামাসা করেন কিন্তু কাজ দেন না। তৃতীয় দিনে ছাত্রীর উদ্‌বেগ অনেকটা কমে এল। সপ্তম দিনে এ পরীক্ষা যখন শেষ হল তখন দেখা গেল ছাত্রী বেশ প্রসন্ন। নন্দলাল তাঁকে প্রশ্ন করলেন কী শিখলে, ছাত্রী জবাব দিলেন, অনেক নতুন জিনিস দেখলাম, বুঝতে পারছি কেন আপনি আমার কাজ বন্ধ করেছিলেন। নন্দলাল তাঁকে বললেন এখন তুমি ইচ্ছামত কাজ করতে পার। এই পরীক্ষার পর ছাত্রীর শিল্পবোধের আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটল এবং তাঁর মৌলিক রচনাতে যে নীরসতা ছিল সেটি অনেক পরিমাণে দূর হল।

যন্ত্রের মতো পরিশ্রম করা বা ভাবের ঘোরে বিনাকর্মে দিন কাটানো— এই দুই দিকের সমস্যাকে নন্দলাল কখনো কাজের চাপ দিয়ে কখনো বা কাজ থেকে নিরস্ত রেখে ছাত্রছাত্রীদের মনের অবসাদ ও অবসন্নতা দূর করার চেষ্টা করতেন। কার্যসূচী বহু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হলেও প্রয়োজনমত এই-সব নিয়ম ভেঙে দেবার পথ তিনি মুক্ত রেখেছিলেন। কারণ শিক্ষকরা তখন ভিত্তিচিত্র বা মূর্তির বড়ো পরিকল্পনা করতে চেয়েছেন। নন্দলাল সহকারীরূপে ছাত্রছাত্রীদের তাঁদের কাছে পাঠাতেন। সহকারীরূপে কাজ করার কালে ছাত্রছাত্রীদের নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম অনুযায়ী কাজ করতে হত না। নন্দলাল বিশ্বাস করতেন যে আর্টিস্টের জোগাড়ে হয়ে যত শেখা যাবে স্টুডিয়োতে বসে ছাত্ররা শিক্ষকদের কাছে তেমন করে শিখতে পারবেন না। কারণ এখানে তাঁরা কিভাবে মৌলিক রচনার নানা সমস্যা সমাধান করতে হয় সেটি শিখতে পারবেন। যে-সব

ছাত্রী হাতের কাজ শিখতেন তাঁরা দৈবাৎ এই-সব কাজে যোগ দিতেন। একই রকম শিক্ষা-ব্যবস্থা থাকলেও ছাত্রীদের এক অংশ কলাভবনের শিক্ষার আদর্শের মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছিলেন ১৯৪০ সালের প্রারম্ভে।

বিশ বছরের মধ্যে কলাভবনের খ্যাতি ভারতের সুদূর প্রান্ত সিংহল, যবদ্বীপ পর্যন্ত পৌঁচেছিল। রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয় ইত্যাদির প্রভাব ভারতের যে-সব অঞ্চলে বিস্তৃত হয়েছিল প্রধানত সেই-সব স্থান থেকে বহু ছাত্রছাত্রী কলাভবনে যোগ দিয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে যে-সব শিক্ষার্থী কলাভবনে যোগ দিলেন তাঁদের সঙ্গে প্রথম যুগের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বড়ো রকমের পার্থক্য দেখা যায়। সেই পার্থক্যটি কলাভবনের শিক্ষানীতিকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল বলেই বিষয়টির উল্লেখ দরকার।

১৯৩৫ সাল পর্যন্ত যে-সব ছাত্রছাত্রী কলাভবনে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা বা তাঁদের অভিভাবকরা অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল-প্রবর্তিত শিল্পধারার দ্বারা বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। পরবর্তীকালে যে-সব ছাত্ররা এলেন তাঁদের মানসিক গঠন ছিল কিছু ভিন্ন রকমের।

ইতিমধ্যে পাশ্চাত্য শিল্পের নূতন ধারা সম্বন্ধে শিক্ষিত সমাজ ধীরে ধীরে সচেতন হয়েছেন। গগনেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের চিত্ররূপ শিল্পীসমাজে নূতন দৃষ্টিকোণ খুলে দিয়েছে। পাশ্চাত্য শিল্পের নূতনতম ধারা সম্বন্ধে তরুণ শিল্পীসমাজ সচেতন হতে চলেছেন এবং নূতন ভাবধারাকে কেন্দ্র করে শিল্পীগোষ্ঠীর কার্যকলাপ শুরু হয়েছে কলকাতা শহরে।

শান্তিনিকেতনের শিক্ষা এই নূতন ভাবধারাকে অনেক পরিমাণে স্বীকার করেছিল এ কথা পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি। সমকালীন কোনো শিল্পকেন্দ্রেই অনুরূপ চেতনা তখন ছিল না। এই কারণে যে-সব আধুনিক মনোভাবাপন্ন ছাত্ররা কলাভবনে যোগ দিলেন তাঁদের পক্ষে কলাভবনের পরিবেশ সম্পূর্ণ অনুকূল ছিল। কাজেই আধুনিকতার ছোঁয়াচ কোনো কোনো

ছাত্রের মধ্যে সহজেই আত্মপ্রকাশ করল। পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে শিক্ষার বিষয় এক থাকলেও শিক্ষাপদ্ধতি বিভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়েছে শিক্ষকদের প্রভাবে। অবনীন্দ্র-পরম্পরা অথবা প্রত্যক্ষভাবে ভারতীয় শিল্পের অনুকরণ এই সময় কলাভবনে স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায় না। কলাভবনের শিক্ষানীতি যে কক্ষচ্যুত হতে চলেছে এটি নন্দলাল লক্ষ্য করলেন। আধুনিকতার মনোভাব বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে অনুলেখন ও আলংকারিক নক্‌শা এবং হাতের কাজ বাধ্যতামূলক না হলেও বিষয়গুলি সকল ছাত্র যাতে চর্চা করেন সে বিষয়ে নন্দলাল পূর্বের চেয়ে বেশি সতর্ক হলেন। শিক্ষকের স্বাধীনতা ও অন্যান্য বিষয়ে অবস্থা-ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন না হলেও কলাভবনের শিক্ষা অনেক পরিমাণে নির্দিষ্ট হয়ে উঠল ১৯৪০ সালের পর।

ছাত্রের সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে শিক্ষকের সংখ্যাও বেড়েছে। সকল শিক্ষকই কলাভবনের প্রাক্তন ছাত্র। ইতিপূর্বে প্রথা ছিল একই শিক্ষক অধীনস্থ ছাত্রদের সকল বিষয় দেখাতেন। ক্রমেই এই রীতির পরিবর্তন এবং এক-একজন শিক্ষক এক-একটি বিষয় শেখাবার ভার পেলেন। নক্‌শার কাজ এবং কারুশিল্প শিক্ষয়িত্রীদের অধীনে পূর্বের মতোই রইল। দেখা ও করা দুই-এর সম্বন্ধ অব্যাহত রাখার জন্য ছোটো বড়ো পিক্‌নিকের প্রবর্তন করা হয়েছিল কলাভবনে। সুবিধেমত নন্দলাল সময়ে অসময়ে সদলবলে বাইরে যেতেন। কখনো কখনো দু-চার দিন বা এক সপ্তাহ কাল আশ্রমের আশেপাশে তাঁবু ফেলে ছাত্ররা থাকতেন। শিল্পীমনের জড়ত্ব ভাঙবার এই ছিল নন্দলালের অব্যর্থ উপায়।

১৯৪০ সালের পর অনুরূপ পিকনিক বা বাইরে থাকার ব্যবস্থা কিছুটা কমে আসে। বহুসংখ্যক ছাত্রছাত্রী ও আশ্রমের নিয়ম ইত্যাদির প্রভাবে বাইরে যাবার পথ সংকীর্ণ করে আনতে বাধ্য হয়েছিলেন নন্দলাল।

লক্ষ্য করা যায় রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অনতিকালের মধ্যে তাঁর শিক্ষাব্যবস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্কুল, কলাভবন, সংগীত-ভবন ও বিশ্বভারতীর গবেষণা বিভাগের প্রভাব প্রতিপত্তি ম্লান হয়ে আসে।

রবীন্দ্রনাথের-প্রবর্তিত ঋতু-উৎসব, নাটক-অভিনয় ইত্যাদি উৎসবগুলি লৌকিক আচারের মতো শাস্ত্রবদ্ধ করে তোলার চেষ্টা দেখা যায়।

কলাভবনের শিক্ষা-আদর্শকেও নন্দলাল বাঁধাপথে চালিত করবার জন্ত পাঠক্রমের আরো কিছু পরিবর্তন আনলেন। এই পরিবর্তনের দ্বারা আলপনা, চামড়ার কাজ ইত্যাদি কারুশিল্প বাধ্যতামূলক হয়।

কলাভবনের ঐতিহ্য দৃঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্ত নন্দলালের উদ্যোগ-আয়োজনের লক্ষণ এই সময় তাঁর সহকারীরা লক্ষ্য করলেন। প্রথম ভারতীয় পরম্পরার অনুশীলন, পরে পাশ্চাত্য শিল্পের দিকে ছাত্ররা দৃষ্টি দেবেন এই ভাবে নন্দলাল শিক্ষকদের নির্দেশ দিলেন।

বিভিন্ন শিক্ষকের প্রভাব যতদূর সম্ভব মুছে ফেলবার চেষ্টা করলেন নন্দলাল। ছাত্রদের আকৃষ্ট করার ক্ষমতাকে এক সময় নন্দলাল সকল দিক দিয়ে সমর্থন করেছিলেন। নূতন পরিস্থিতিতে তিনি সকল শিক্ষককে এক সূত্রে গাঁথবার চেষ্টা করলেন। যদি বিশেষ কোনো শিক্ষকের কাছে ছাত্রের ভিড় দেখা দিত তবে নন্দলাল এই অবস্থাকে ভেঙে দেবার ব্যবস্থা করতেন। কারণ তিনি মনে করতেন যে এই ভাবে কলাভবনে স্বতন্ত্র দল গড়ে উঠতে পারে এবং আভ্যন্তরীণ অবস্থার বিপর্যয় ঘটতে পারে। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সৃষ্টিরত শিল্পীর প্রভাব ছাত্রদের উপর প্রতিফলিত হতে বাধ্য— এই সত্যটি তিনি যে কোনো কারণেই হোক অস্বীকার করলেন। কলাভবনের প্রগতিবাদী শিক্ষা সংস্কারাশ্রিত হয়ে উঠতে বিলম্ব হল না। যে ভাবে নন্দলাল কলাভবনকে চালিত করেছিলেন সেই আদর্শ সম্বন্ধে নন্দলালের মনে যে, কোনোরকম দ্বিধা ছিল না এমন নয়। কলাভবনের শিক্ষার ক্ষেত্রে যে আদর্শকে এই সময় প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি উদ্যত হয়েছিলেন তাঁর সমকালীন রচনাতে কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব প্রকাশ পেয়েছে। নন্দলালের রচনা ও তাঁর অসংখ্য স্কেচ্ এবং তাঁর প্রত্যক্ষ শিষ্যদের রচনার রীতি-নীতি উপরের এই উক্তির প্রমাণরূপে নেওয়া চলে।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অনতিকালের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর আচার্যরূপে শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হন। নন্দলাল কলাভবনে অবনীন্দ্রনাথের জন্ত একটি

স্বতন্ত্র আসন ও স্থান নির্দিষ্ট করে রাখলেন। প্রতিদিন সকালে অবনীন্দ্রনাথ নির্দিষ্ট স্থানে এসে বসেন। ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের আসন ছেড়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। অবনীন্দ্রনাথ নিজে ছোটোখাটো ছবি করেন জলরঙে বা প্যাস্টেলে। অবনীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে নন্দলাল যে আনন্দ ও উৎসাহ অনুভব করেছিলেন ক্রমে সেটি নিষ্প্রভ হয়ে এল। ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের আসন ছেড়ে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে গল্প করে কাটাচ্ছেন এ দৃশ্য তিনি অধিককাল সহ্য করলেন না। তিনি আদেশ দিলেন কোনো ছাত্রছাত্রী সকালে নিজের আসন ত্যাগ করবে না।

বাঁধা নিয়মে শিল্প-শিক্ষার আদর্শ অবনীন্দ্রনাথের স্বভাববিরুদ্ধ। এই কারণে কলাভবনের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর আপত্তি তিনি ছাত্রছাত্রীদের কাছেও ব্যক্ত করতে কুণ্ঠিত হন নি। তাঁর মতের সঙ্গে নন্দলালের তৎকালীন মতের প্রচুর পার্থক্য ছিল, এই কারণে নন্দলালের উদ্‌বেগ ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। নন্দলাল বললেন, 'অবনবাবু দখল দেওয়া দুধ নেড়ে দিলেন।' ক্রমে অবনীন্দ্রনাথের আশেপাশে ছাত্রছাত্রীদের ভিড় হ্রাস পেল। একক অবনীন্দ্রনাথ নিজের আসনে এসে বসেন, দৈবাৎ কোনো ছাত্রছাত্রী বা অধ্যাপক তাঁর কাছে উপস্থিত হন। একসময় অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালের চিন্তাধারা বুঝতে পারলেন এবং কলাভবনে আসা অনেক কমিয়ে দিলেন। অবশ্য নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রতিদিন দেখা করা বন্ধ করলেন না এবং সকলের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সম্পর্ক অটুট রইল।

শিক্ষার রীতি-পদ্ধতি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে গুরুশিষ্যের মধ্যে যে মতভেদ ঘটেছিল সেইটির ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট, এই কারণে বিষয়টি একটু তলিয়ে দেখা দরকার। অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন সকল সময়ে দলবদ্ধ ভাবে শিল্পশিক্ষার বিরোধী অপর দিকে নন্দলাল একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অধিনায়ক; নিয়ম-শৃঙ্খলা, শিক্ষার বিধিব্যবস্থার সাহায্যে কলাভবনকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত করার জন্য তিনি সচেতন ছিলেন। শিক্ষার আদর্শ ও প্রতিষ্ঠান চালনার দায়িত্ব সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে এই আদর্শগত ভেদ কোনোদিনই সম্পূর্ণ দূর করতে পারা যায় নি।

নন্দলাল যথাসাধ্য এই দুই আদর্শের মধ্যে সংযোগের চেষ্টা করেছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ চরমপন্থী। এই অবস্থায় কেউই সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত আলাপ-আলোচনার পথ অনুসন্ধানের চেষ্টা করলেন না। এই কারণে সংঘাত তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছিল। পরবর্তীকালে নন্দলাল যে কলাভবনকে একটি ঐতিহ্যবাহী শিল্পবিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার দিকে অগ্রসর হয়েছেন তারই সূচনা এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে।

মুহূর্তের জন্য কলাভবনে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, সেটি দূর হতে বিলম্ব হল না। ইতিমধ্যে প্রবীণ অধ্যাপকদের অন্যতম বিনায়ক মসোজী, ছাত্র শিক্ষকদের মধ্যে চক্রবৎ গতিকে অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য, যে উপায় উদ্‌ভাবন করেছিলেন সেটি কলাভবনে পরবর্তীকালে বহুদিন পর্যন্ত অনুসৃত হয়েছে বলেই সংক্ষেপে উদ্‌ভাবিত বস্তুটির বিবরণ দেওয়া গেল। ছাত্রছাত্রীদের এক-একটি নির্দিষ্ট দলের নাম লেখা একটি গোলাকার কাগজ অনেকটা লটারী বোর্ডের মতো। এই কাগজের উপর শিক্ষকদের নাম লেখা একই মাপের আর-একখানি খোপকাটা কাগজ, এই খোপ বা ফাঁকগুলো ঘোরালেই ফাঁকের মধ্য দিয়ে এক একদল নির্দিষ্ট ছাত্রছাত্রীর নাম নজরে পড়ত। প্রত্যেক ফাঁকের উপরভাগে শিক্ষকদের নাম লেখা, দুটি কাগজ পিন দিয়ে মাঝখানে আটকানো। এই ভাবে উপরের শিক্ষকদের নাম-লেখা কাগজ ঘোরাবার ব্যবস্থা হল। নির্দিষ্ট সময়ে প্রয়োজনমত উপরের কাগজ ঘুরিয়ে দেওয়া হত। ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা ফাঁকের মধ্য দিয়ে দেখতেন কার অধীনে কোন্ ছাত্রছাত্রীরা কাজ করবেন, অপর দিকে ছাত্রছাত্রীরাও বুঝতেন কোন্ শিক্ষকের কাছে তাঁদের কাজ করতে হবে। 'চাকা' নামে পরিচিত এই বস্তুটির প্রবর্তনের ফলে ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে কোনো শিক্ষকের কাছে নির্ধারিত সময়ের অধিক দিন কাজ করার সম্ভাবনা রইল না।

১৯৪৫ সালে গান্ধীজি বিশ্বভারতী পরিদর্শনে আসেন। এই সময় তিনি বিশ্বভারতীর প্রধানদের সঙ্গে বিভাগীয় সমস্যা সম্বন্ধে একটি ঘরোয়া আলোচনা

করেন। এই সভায় কলাভবন সংক্রান্ত নন্দলালের উক্তির সারমর্ম এখানে উদ্‌ধৃত করা গেল—

'Kala Bhavana began as a studio. But it had now become a teaching institute, Teaching and administrative work made heavy inroads upon his time and art suffered. The chief difficulty was to find a suitable successor who would command the willing allegiance of his colleagues and at the same time worthily represent the spirit of the institution.'

নন্দলালের এই স্বীকারোক্তিকে লক্ষ্য করে গান্ধীজি বলেন—

...'it is a difficulty of our own making. If a person conducts a big department, he is expected to transmit what he stands for to someone who can be termed as his successor.'

গান্ধীজির বক্তব্য আরো পরিস্ফুট হল যখন তিনি বললেন—

...'there is no difficulty but can be overcome by *tapascharya*.[১]'

---

১ গান্ধীজির এই উক্তিগুলি কোথাও লিপিবদ্ধ আছে বলে লেখকের জানা নেই। এগুলি তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম বলা উচিত। দ্র. The Santiniketan Pilgrimage by Pyarelal, Gandhi Memorial Peace Number, *Visva-Bharati Quarterly*, p. ৩০৮-৩০৯।

৫

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসাবে কলাভবনকে প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা

গান্ধীজি ও নন্দলালের সাক্ষাতের মুহূর্ত থেকে নন্দলালের অবসর-গ্রহণের সময় পর্যন্ত কলাভবনের শিক্ষানীতি যে দিকে চালিত হয়েছিল সেটির প্রধান লক্ষ্য ছিল ভারতীয় অলংকরণ-শিল্পের অনুশীলন। বিভিন্ন শিক্ষকের প্রভাব সম্বন্ধে নন্দলাল সকল সময়েই সচেতন ছিলেন। পরবর্তীকালে শিক্ষকদের ব্যক্তিগত প্রভাব অপেক্ষা শিক্ষানীতি যাতে নির্দিষ্ট পথে চালিত হয় সেই দিকে তিনি লক্ষ্য দিলেন। এইভাবে ব্যক্তিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে তিনি একটি প্রতিষ্ঠানের উপযোগী করে কলাভবনের শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। কারণ প্রবীণ শিক্ষকদের প্রভাব ও অলংকরণ-শিল্পের চর্চার মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব ইতিপূর্বেই দেখা দিয়েছিল।

আলোচনাপ্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করেছি যে নক্‌শার কাজ ও কারুকলা নন্দলাল নিজের হাতে রেখেছিলেন এবং এই বিষয়টি আবশ্যিক করার চেষ্টা তিনি বারংবার করেন। কিন্তু বিষয়টি সম্বন্ধে উপযুক্ত আগ্রহ ছাত্রদের মধ্যে দেখা দেয় নি। ছাত্রদের মধ্যে এই উদাসীনতার কারণ নন্দলাল কখনো অনুসন্ধানের চেষ্টা করেন নি। তাঁর ধারণা হয়েছিল যে ছাত্ররা বিদেশী শিল্পের দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়ার কারণেই নক্‌শার কাজ করতে তাঁদের আপত্তি। ছবি বা মূর্তি নির্মাণের উপাদানরূপে ডিজাইনের উপযোগিতা সম্বন্ধে প্রবীণ অধ্যাপক ও নব্য ভাবাপন্ন ছাত্রদের মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। এবং এই বিষয় সম্বন্ধে নন্দলালের উপদেশ শিক্ষক ছাত্রনির্বিশেষে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে সকল সময়ই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ডিজাইনের নামে যে অলংকরণ-কর্ম কলাভবনে শিক্ষার প্রধান অঙ্গরূপে দেখা দিয়েছিল সে সম্বন্ধে নন্দলাল ও প্রবীণ শিক্ষকদের মধ্যে মতভেদ ছিল যথেষ্ট।

অলংকরণ-শিল্পের বুনিয়াদরূপে প্রবর্তিত হয়েছিল আলপনা। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের পথে বিভিন্ন ফুল আলপনার উপাদানরূপে প্রবর্তিত হয় সর্বপ্রথম।

ক্রমে এইসব ফুল, পাখি, মাছ ইত্যাদির আলংকারিক রূপ ডিজাইনের আদর্শরূপে ছাত্র-পরম্পরায় কলাভবনে চালু হয়। ক্রমশ প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণের অভ্যাস অলংকরণ-শিল্পের ক্ষেত্রে হ্রাস পায়। কেবলমাত্র অনুলেখনের পথে আলংকারিক আকারগুলিকে আয়ত্ত করার চেষ্টা শুরু হয়। এই ত্রুটি যে নন্দলাল লক্ষ্য করেন নি এমন নয়। ১৯৩৯ সালে জনৈকা ছাত্রী তাঁকে প্রশ্ন করেন যে—'আলপনা আমার একঘেয়ে লাগে কেন?' জবাবে নন্দলাল বলেন যে, 'Nature দেখতে ভুলে যাওয়ার কারণে এই ত্রুটি হয়েছে, কেবল মুখস্থবিদ্যার উপর নির্ভর করে নূতন ডিজাইন করা যায় না।' তিনি আরো বলেন যে, 'আঙুল ছাড়া হাত ও Nature ছাড়া ডিজাইন দুটোই অকেজো।'[১]

আলপনা, চামড়ার কাজ, বাতিকের কাজ, ছাঁচের নকশা, সেলাই ইত্যাদি যতগুলি হাতের কাজ ইতিমধ্যে প্রবর্তিত হয়েছিল সকল ক্ষেত্রেই একই নকশার প্রয়োগ তৎকালীন কারুকর্মে প্রকাশ পেয়েছিল। নানা উৎসব উপলক্ষে যে-সব আলপনা দেওয়া হত সেগুলি ছাত্রছাত্রীরা ট্রেসিং করে নিতেন, এইভাবে তাঁরা নকশার কাজের পুঁজি তৈরি করতেন। ১৯৪৫ সালের পর কলাভবন-প্রবর্তিত আলংকারিক রীতি চিত্ররচনার আদর্শরূপে প্রবর্তিত করার প্রয়াস করেন নন্দলাল। ১৯৪০ সালের প্রারম্ভে নন্দলাল যে সমস্যাগুলির সম্মুখীন হয়েছিলেন সেগুলির সমাধানে কিছু পরিমাণে তিনি সক্ষম হলেন এই সময়। এখন থেকে শিল্পশিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ভারতীয় পরম্পরা।

কলাভবন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আন্তর্জাতিক আদর্শকে কেন্দ্র করে। পাশ্চাত্যের প্রভাব বর্জন করা অপেক্ষা গ্রহণ করার দিকেই রবীন্দ্রনাথ নন্দলাল প্রমুখ শিল্পীদের চালিত করার চেষ্টা করেন এবং সুযোগ-সুবিধামত বিভিন্ন প্রভাব প্রতিফলিত যাতে হয় সে চেষ্টা রবীন্দ্রনাথ বারংবার করেছেন, এ বিষয়ে নূতন করে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। বিভিন্ন প্রভাবের মিশ্রণে কলাভবনের একটি নূতন দৃষ্টিকোণ খুলে যায় এবং প্রাচ্য ও আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পের বহু

১ দ্র. পরিশিষ্ট ২।

উপাদান সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে সক্ষম হন নন্দলাল ও কলাভবনের শিল্পীরা। এই কারণেই আধুনিকতার পথিকৃৎরূপে কলাভবনে র অবদান আজ সর্বত্র স্বীকৃত।

কলাভবনের শিক্ষাপদ্ধতি আলোচনা-প্রসঙ্গে এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে পরম্পরার ব্যাপক তাৎপর্য অপেক্ষা ভারতীয় পরম্পরার নির্দিষ্টরূপের দিকে শিক্ষানীতি চালিত করার প্রয়াস করেন নন্দলাল। ক্রমে নন্দলালের এই মনোভাব দৃঢ় সংকল্পে পরিণত হয়। পাশ্চাত্য প্রভাব থেকে কলাভবনকে রক্ষা করার দিকে তিনি দৃষ্টি দেন। এবং ১৯৪৫ সালের পর এই সংকল্প অনুযায়ী বিজাতীয় প্রভাব বহু পরিমাণে দূর করতে তিনি সক্ষম হন। কেবল মূর্তিকলার ক্ষেত্রে নন্দলালের এই আদর্শ সক্রিয় হয় নি। সে ক্ষেত্রে আধুনিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা অব্যাহত থেকেছিল। এই কারণে পরবর্তীকালে নব্য ভাবাপন্ন ছাত্ররা এই বিভাগের দিকে অধিক তর আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

এই সময় নন্দলাল-প্রবর্তিত শিক্ষার প্রধান অবলম্বন অলংকরণ। আলপনার সাহায্যে অলংকরণ-সজ্জা সম্বন্ধে সকল ছাত্রদের তিনি সচেতন করে তোলার চেষ্টা করলেন। অপর দিকে মৌলিক রচনার ক্ষেত্রে আলংকারিক বিন্যাস ভারতীয়ত্বের আদর্শরূপে নন্দলাল ছাত্রদের কাছে উপস্থিত করলেন।

শান্তিনিকেতনের ঋতু-উৎসব, হিতোপদেশ ও ঈশপের গল্প ইত্যাদি আখ্যান-উপাখ্যান অবলম্বনে মৌলিক রচনা করার নির্দেশ দিলেন নন্দলাল। এই ভাবে বর্ণ, রেখা, বিষয় সকল ক্ষেত্রেই একটি সংস্কার তিনি গড়ে তুললেন। নন্দলালের প্রভাবে যে নূতন সংস্কার দেখা দিল তার সঙ্গে ভারতীয় পরম্পরার সম্বন্ধ কতটা গভীর সেটি অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। অলংকরণ ভারতীয় শিল্পের বাহিক সৌষ্ঠব। মধ্যযুগীয় ধাতুমূর্তিতে এই লক্ষণ যথেষ্ট স্পষ্ট। তবে ভারতীয় শিল্পের পরম্পরা মধ্যযুগীয় ধাতুমূর্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

ভারুত-সাঁচীর উৎকীর্ণ মূর্তি, অজন্তা বা বাঘগুহা চিত্রের শ্রেষ্ঠ অংশে অথবা মহাবলীপুরমের মূর্তিতে অলংকরণের আতিশয্য নেই। আকারে, ভঙ্গিতে, ইমারতী বাঁধনের দৃঢ়তায় ভারতীয় শিল্পের বৈশিষ্ট্য কোনো শিল্পীর দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার বস্তু নয়। নন্দলালের অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে যে যথেষ্ট ছিল তার সাক্ষ্য

তাঁর রচনা। ভারতীয় শিল্পের বৃহৎ পটভূমির পরিবর্তে অলংকরণরীতি আদর্শ বলে কেন নন্দলাল গ্রহণ করেছিলেন এ প্রশ্নের জবাব তাঁর কোনো রচনাতে পাওয়া যায় না। নন্দলালের যে-সব সহকর্মী এ পর্যন্ত তাঁকে বিনা তর্কে অনুসরণ করেছিলেন তাঁদের দু-এক জন নন্দলালের এই নূতন পরিকল্পনা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। নন্দলাল বলেন যে ক্রমেই ছাত্রীসংখ্যা বাড়ছে। তাই মেয়েদের উপযোগী করে শিক্ষাসংস্কার করতে তিনি বাধ্য হলেন। তিনি বলেন একজন মেয়ের মনে শিল্পবোধ জাগাতে পারলে সেটি ভবিষ্যতে একটি পরিবারের মধ্যে সংক্রামিত হবে। এইভাবে শিল্পবোধ দেশের মধ্যে জাগতে পারে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে ভারতীয় শিল্পপরম্পরার আদর্শ উপলব্ধি করতে হলে অলংকরণ সম্বন্ধে জ্ঞান হওয়া প্রয়োজন। ভারতীয় শিল্পীর হাতিয়ার হিসাবে তাই তিনি অলংকরণ-কর্মকে প্রাধান্য দিতে চাইছেন।[১]

প্রতিষ্ঠান ও পরম্পরা উভয় দিকের দাবিতে যে রীতি নন্দলাল প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন, তাঁর রচিত চিত্রের গতি ছিল সেই সময় সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী। সে ক্ষেত্রে পাওয়া যায় দৃঢ় ও নিরাভরণ রূপ নির্মাণ। অবশ্য নিজের প্রবর্তিত শিক্ষারীতিকে দৃঢ়তর করার সংকল্প নিয়ে তিনি কিছু আলংকারিক শিল্পরূপ রচনা করেছেন। কালি-তুলির কাজে, অসংখ্য পোস্টকার্ডে শিল্পী নন্দলালের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও গভীর উপলব্ধির যে সাক্ষ্য পাওয়া যায়, অনুরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা উপলব্ধির পথে শিল্পসৃষ্টির সুযোগ-সুবিধা কিছু পরিমাণে রুদ্ধ হয়েছিল নন্দলাল-প্রবর্তিত তৎকালীন শিক্ষানীতির দ্বারা।

কয়েকজন তরুণ ও প্রবীণ শিল্পীর সহযোগিতায় কলাভবনে শিক্ষা শুরু হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এই শিল্পীগোষ্ঠীকে সকল রকমের সংকীর্ণতা থেকে আত্মরক্ষা করতে উপদেশ দিয়েছেন। নন্দলাল অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে

---

১ অলংকারকেন্দ্রিক শিল্পের সূচনা কিভাবে সুকুমারী দেবীর মধ্যস্থতায় শুরু হয়েছিল সে কথা যথাস্থানে আমরা উল্লেখ করেছি। ক্রমে তাঁর ছাত্রী গৌরী ভঞ্জ ও অন্যান্য মহিলা শিল্পীদের দ্বারা এই রীতি আজ জনপ্রিয় হয়েছে। নন্দলাল-প্রবর্তিত অলংকরণকেন্দ্রিক শিক্ষা-পরিকল্পনার অন্যতম অংশীদাররূপে গৌরী ভঞ্জের নাম বিশেষ স্মরণীয়।

এই আদর্শকে রূপ দিয়েছেন। ক্রমেই তাঁর রক্ষণশীল মনোভাব আত্মপ্রকাশ করে।

নন্দলাল শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্রে যে রক্ষণশীল আদর্শ উপস্থিত করলেন তার সমর্থন কোথাও পাওয়া যায় না। গুরু অবনীন্দ্রনাথ যে পরম্পরা-বিরোধী এ কথা তাঁর রচনার যত্র তত্র পাওয়া যাবে। রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, গান্ধী তাঁরা সকলেই ভারতের ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, তৎসত্বেও তাঁরা পাশ্চাত্য প্রভাবকে আত্মীকরণ করার উপদেশ দিয়েছেন ভারতবাসীকে। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে—

> যদ্যপি ভয় আছে যে, এই পাশ্চাত্য বীর্যতরঙ্গে আমাদের বহুকালার্জিত রত্নরাজি বা ভাসিয়া যায়; ভয় হয়, পাছে প্রবল আবর্তে পড়িয়া ভারত-ভূমিও ঐহিক ভোগলাভের রণভূমিতে আত্মহারা হইয়া যায়; ভয় হয়, পাছে অসাধ্য, অসম্ভব এবং মূলোচ্ছেদকারী বিজাতীয় 'ইতোনষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ' হইয়া যাই। আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ। যাহা দুর্বল, দোষযুক্ত; তাহা মরণশীল— তাহা লইয়াই বা কি হইবে? যাহা বীর্যবান বলপ্রদ তাহা অবিনশ্বর; তাহার নাশ কে করে?[১]

যে আশঙ্কা সম্বন্ধে বিবেকানন্দের এই বাণী সেই আশঙ্কাতেই নন্দলাল উদ্‌বিগ্ন হয়েছিলেন। যে কোনো কারণেই হোক নন্দলাল নব্যকালের রুচি মেজাজ, আচার-ব্যবহার সকল বিষয়েই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন। ধীরে ধীরে এই অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পায়। এই অসহিষ্ণুতার প্রকাশ তাঁর পরবর্তী কালের শিক্ষানীতি। নন্দলালের শিক্ষার দুই দিকের কথা আমরা আলোচনা করেছি। পরবর্তীকালে তাঁর অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে কলাভবনের শিক্ষাব্যবস্থা যে সংকীর্ণ ও অলংকরণ-কেন্দ্রিক হয়ে পড়েছিল সে কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তা হলেও নন্দলালের শিক্ষাদর্শ যে এই ত্রুটির জন্যই সম্পূর্ণ মূল্যহীন

১ বর্তমান সমস্যা, বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, পৃ. ৩৬-৩৪।

হয়ে পড়েছে এমন ধারণাকে প্রশ্রয় দেওয়াও চলে না। এই আলোচনায় কারো যাতে ভ্রান্ত মনোভাব গড়ে না ওঠে সে কারণে শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্রে নন্দলালের অবদানের পরিচয় একটু স্পষ্ট করে দেওয়া গেল। আলোচনাটির পুনরাবৃত্তি করছি এবং তাঁর শিক্ষানীতির মূলসূত্র ও নির্যাসটুকু (essence) বুঝে নেওয়া বোধ হয় এতে সহজ হবে।

প্রথমত নন্দলাল ভারতীয় শিল্পকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করার পথ করে দিয়েছিলেন। শিল্পজীবনের সঙ্গে ভারতীয় কারিগরদের সম্পর্ককে তিনিই প্রথম সার্থকতায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সকল শিল্পকর্মের মূল সত্য যে ডিজাইন, তার মূল্য কিভাবে দিতে হবে, ব্যক্তিগত মতি-মেজাজের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কী প্রকার এ-সব তত্ত্ব ও তথ্য শিল্পীরা তাঁর কাছ থেকেই প্রথম পেয়েছিলেন। এ তো গেল আদর্শের কথা।

দ্বিতীয়ত আসে প্রত্যক্ষভাবে তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির কথা। শিক্ষক হিসাবে নন্দলাল কখনো ছাত্রদের কাজের উপর সংশোধন করে দিতেন না। প্রয়োজন হলে একটি স্বতন্ত্র কাগজে এবং আরো পরবর্তীকালে ট্রেসিং পেপারে কাজ দেখিয়ে দিতেন। আদর্শ বা মডেলের ক্ষেত্রে (reference) তিনি সর্বদাই প্রকৃতির দরজায় দাঁড়ানোর কথা বলেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন শুধু তাই নয় ছাত্ররা তা যথাযথ পালন করছে কি না সে দিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। কিন্তু কোনো সময়েই তিনি প্রকৃতি থেকে আঁকা স্কেচের প্রত্যক্ষ অনুসরণে চিত্ররচনা পছন্দ করতেন না।

পরিণত শিক্ষার্থীদের কাছে নন্দলালের সর্বপ্রধান নির্দেশ ছিল এই যে বিষয়ের সঙ্গে একাত্মবোধ বা identification : গাছের সঙ্গে গাছ, জলের সঙ্গে জল, সাঁওতালের সঙ্গে সাঁওতাল যতক্ষণ না 'বনে' যেতে পারছি, ততদিন পর্যন্ত এদের চিত্ররূপ কৃত্রিম (artificial) হতে বাধ্য এবং কৃত্রিমতা দিয়ে কিছু শিল্পসৃষ্টি হয় না এই ছিল নন্দলালের বীজমন্ত্র। সকলের কথা সঠিক বলতে না পারলেও তাঁর অন্তত: আদিকালের শিষ্যদের সম্বন্ধে জোর দিয়ে বলা যায় যে তাঁরা প্রত্যেকেই স্মরণ রেখেছেন যে নিজের সৃষ্টি করার ক্ষমতা যাঁর নেই

তাঁর শিক্ষক হওয়ারও যোগ্যতা নেই। কারণ প্রতিদিন নতুন করে নিজে কিছু সৃষ্টি না করতে পারলে শেখানোর মতো একটা সৃষ্টিশীল কাজে অধিকার জন্মাবে কেমন করে? শিক্ষা শেষ করে আশ্রম ত্যাগের প্রাক্কালে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর কাছেই তাঁর উপদেশ ছিল এই যে আশেপাশের বিভিন্ন কারিগরদের সঙ্গে সঙ্গ করবে। কেউই নগণ্য নয়। যে ভালো তরকারি কুটতে পারে, অনুধাবন করলে দেখবে তার কাছেও কিছু নেওয়ার আছে, শেখার আছে। সবসময় স্মরণ রেখো শুধু বুদ্ধিগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা (intellectual speculation) বা টেকনিকের মারপ্যাচ দিয়ে সার্থক সৃষ্টি কখনো হতে পারে না।[১]

কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৫১ সালে রবীন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করে। এই ঘটনার এক বৎসর পরে নন্দলাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত অধ্যাপকরূপে অবসর গ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় সরকার রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনকানুনের আওতায় রবীন্দ্রনাথের আদর্শের বিকাশ বিবর্তন সম্ভব নয় বলেই রবীন্দ্রনাথ কয়েকজন শিক্ষাব্রতীর সাহায্যে নূতন আদর্শে শিক্ষা প্রবর্তনের সংকল্প করেছিলেন। কন্‌স্টিটিউশন্‌বিদ্‌দের হাতে বিশ্বভারতীর যে অধ্যায় দেখা দিল সেটি রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত আদর্শের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। বুধবারের মন্দির, বৈতালিক, ঋতু-উৎসব ইত্যাদি কতকগুলি সংস্কার ব্যতীত রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত শিক্ষার আদর্শ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করে নি। এই কারণে শিল্প এবং সংগীত— এই দুই বিভাগের উন্নতির জন্য বিশেষ কোনো চেষ্টা সে সময় হয় নি।

রবীন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হওয়ার

১ নন্দলালের এই সুপরিস্ফুট বক্তব্যের স্পষ্ট ধারণার জন্য তাঁর শিল্পকথা বইয়ে ছন্দ ইত্যাদি প্রবন্ধগুলি দ্রষ্টব্য।

আলপনার ইউনিটের অনুকৃতি-চিত্র ॥ নন্দলাল বসু

পিছনে একাধিক বিশিষ্ট কারণ অনুসন্ধান করা যেতে পারে। আর্থিক অভাব-অনটন একটি বিশেষ কারণ তা নিশ্চিত করেই বলা চলে। কিন্তু তারও চেয়ে একটি নিগূঢ় কারণ ছিল এবং বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার কাল থেকেই সে কারণটি অঙ্কুরিত হতে দেখা গেছে।

বিশ্বভারতীর ইতিহাসে সচরাচর একটি নামের তাবৎ উল্লেখ হয় না যদিও তিনি দীর্ঘকালের জন্য বিশ্বভারতীর কর্ণধার ছিলেন— তিনি হলেন রথীন্দ্রনাথ। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরগত পরিবর্তন বিবর্তনের মূলে রথীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত প্রভাব ও ইচ্ছা-অভিলাষ কতখানি কাজ করেছে তার সঠিক অনুসন্ধান না হওয়া পর্যন্ত আর্থিক অনটনের চিত্রটিই মৌল ও বৃহৎ বলে অনুমিত হওয়া স্বাভাবিক।

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার সঙ্গে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীর নাম উল্লেখ করেছি। অপর একটি নাম রথীন্দ্রনাথ তিনি শিল্প-ভবনের পরিচালক ছিলেন। কাজেই পরিচালনার-ক্ষেত্রে দুটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব শুরু থেকেই দেখা দিয়েছে, যদিও তুলনাগতভাবে দুটি সমান প্রধান নয়। শিক্ষা-বিষয়ক (academic) কার্যধারার সঙ্গে রথীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন না। ক্রমে তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কলেজ বা শিক্ষাভবন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শুরু থেকেই এই বিভাগটি সম্পূর্ণরূপে রথীন্দ্রনাথের প্রভাবাধীনে থেকেছে।

ইতিমধ্যে একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ অসমর্থ হয়ে এসেছেন এবং বিশ্বভারতীর কার্যসূচীর সঙ্গে তাঁর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে অপর দিকে তেমনই রথীন্দ্রনাথের প্রভাব উত্তরোত্তর প্রতিফলিত হতে শুরু করেছে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে এই সময়ে কলেজ বিভাগটি বাস্তবিকপক্ষে বিশ্বভারতীর প্রধান অঙ্গ হয়ে উঠেছে এবং সংগীতভবন-কলাভবনের অস্তিত্ব অনেকখানি গৌণ হয়ে এসেছে। বলা যেতে পারে এই ভবন দুটি প্রত্যক্ষ-পরোক্ষে জন-সংযোগকারী বিভাগের (Public Relations) একটি ব্যাপকতর অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজ করেছে। কেবলমাত্র নন্দলালের ব্যক্তিত্বে কলাভবনের স্বাধীনতা বহুল পরিমাণে রক্ষিত হয়েছিল।

বিশ্বভারতীর মূল শিক্ষাদর্শে গবেষণা, ভাষা, সাহিত্য, সৃজনশীল বিদ্যাচর্চার যে লক্ষ্য ও প্রতিশ্রুতি ছিল রথীন্দ্রনাথের কর্তৃত্বাধীনে প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় আমলে সেগুলির লক্ষণীয় কোনো বিস্তার বা বিকাশ ঘটাবার চেষ্টা দেখা যায় নি। মূল আদর্শ উপেক্ষিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী বস্তুত একটি সংকীর্ণ গণ্ডিতে পর্যবসিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর শান্তিনিকেতন পরিদর্শন-কালে গান্ধীজি কয়েকটি তীক্ষ্ণোক্তির মধ্য দিয়ে বিশ্বভারতীর এমন অবস্থার বিরুদ্ধেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন।

ভারত সরকার যখন কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দিলেন তখন বিশ্ব-ভারতীর মূল আদর্শ সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন। কাজেই কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপটির সঙ্গে রথীন্দ্রনাথের আশা-আকাঙ্ক্ষা-আদর্শের কথাটি যুক্ত করাই সমধিক বাঞ্ছনীয়। রথীন্দ্রনাথের লক্ষ্যেরই চরম পরিণতি হল কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যা-লয়ের রূপান্তর।

এ প্রসঙ্গে অবশ্যই এ কথা অনস্বীকার্য যে রথীন্দ্রনাথের মতো পরিচালকের হাতে ন্যস্ত না থাকলে বিশ্বভারতীর অস্তিত্ব বোধ হয় আরো আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত, বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হওয়া পর্যন্ত এটুকু বিবর্তনও বোধ হয় সম্ভব হত না।

নন্দলালের অবসর গ্রহণের পর অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে কলাভবনের নূতন অধ্যায় শুরু হয়। কলাভবন প্রতিষ্ঠার মুহূর্ত থেকে সুরেন্দ্রনাথ কলাভবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে যুক্ত থেকেছেন। অভিনয় ও মঞ্চসজ্জায় তিনি ছিলেন অনেকদিন পর্যন্ত নন্দলালের সহকারী। তবে সুরেন্দ্রনাথের সর্বপ্রধান কীর্তি স্থাপত্যের ক্ষেত্রে। শান্তিনিকেতনকে কেন্দ্র করে স্থাপত্যের যে বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে সেটি রবীন্দ্রযুগের সৌন্দর্য ও রুচির সামাজিক প্রকাশ। অধ্যক্ষ-রূপে সুরেন্দ্রনাথ নূতন কোনো পরিকল্পনা প্রবর্তনের পরিবর্তে নন্দলালের আদর্শকে রক্ষা করারই চেষ্টা করেছিলেন। অধ্যক্ষ থাকাকালীন সুরেন্দ্রনাথ মহিলাদের জন্য সার্টিফিকেট কোর্স প্রবর্তন করেন (১৯৫১-৫২)। যে বিষয়-গুলিকে কেন্দ্র করে কলাভবনে হাতের কাজ ও নকশার কাজ শেখানো হত,

তারই অনুসরণে সার্টিফিকেট কোর্সের কাজ শুরু হয়। আলপনা, বাতিক, চামড়ার কাজ, তাঁত, সেলাই ও নকশার কাজ— এইগুলি শিক্ষার বিষয়রূপে গৃহীত হয়। এই সময় কলিকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত একজন শিক্ষক নিযুক্ত হন। এই শিক্ষকের অধীনে কলাভবনের ছাত্রছাত্রীরা বিলেতি ধরনের জলরং, ষ্টিললাইফ, প্রতিকৃতি, পারস্পেকটিভ শিক্ষা শুরু করেন ১৯৫১-৫২ সাল থেকে। নবনিযুক্ত শিক্ষকের সাহায্যে যে বিষয়গুলি প্রবর্তিত হল সেগুলির উপযোগিতা সম্বন্ধে তখন শিল্পীসমাজে সন্দেহ জেগেছে। কারণ বাস্তব অনুকরণের আদর্শ এই সময় শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্রে গৌণস্থান অধিকার করেছে। এই বিষয়গুলি প্রবর্তনের ফলে নন্দলালের আদর্শ যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হল এ কথা বলাই বাহুল্য।

সুরেন্দ্রনাথের পর অধ্যক্ষ ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বর্মণের সময় কলাভবনে শিক্ষা-সংক্রান্ত অর্ডিনেন্স অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থার রদবদল করা হয়। এই সময় থেকে শিল্পের ইতিহাস পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ অনুযায়ী পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়।

আচার্য নন্দলালের অধীনে দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল সে ক্ষেত্রে পরীক্ষার স্থান ছিল অতি সংকীর্ণ। উত্তরকালে নন্দলাল পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। কার্যধারা অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীদের সকল রকমের কাজ দেখে নম্বর বা বিভাগ স্থির করা হত। এ বিষয়ে অধ্যাপকদের মতামত তিনি গ্রহণ করতেন। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করতেন তিনি স্বয়ং। এই কারণে বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত পরীক্ষার সঙ্গে নন্দলাল-প্রবর্তিত পরীক্ষার কোনোই সম্পর্ক ছিল না।

মৌলিক রচনা, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, অনুলেখন, নকশার কাজ, কারুশিল্প এই পুরাতন বিষয়গুলির সঙ্গে পাশ্চাত্য পদ্ধতির পারস্পেকটিভ, ষ্টিললাইফ, প্রতিকৃতি এবং শিল্পের ইতিহাস এই জমাট পাঠ্যক্রম (Compressed Syllabus) আয়ত্ত করা শিক্ষার্থীর পক্ষে যে সহজসাধ্য ছিল না এ কথা বলা বাহুল্য।

বিভিন্ন করণ-কৌশল ও আঙ্গিকগত উৎকর্ষের জন্য যে পুনঃ পুনঃ অভ্যাস

দরকার সে সুযোগ ছাত্রছাত্রীদের ছিল না। এই কারণে বহুবিষয়-আশ্রিত পাঠ্যক্রমের দ্বারা কাজের উৎকর্ষের পরিবর্তে কলাভবনে শিল্পশিক্ষা অধিকতর যান্ত্রিক হয়ে আসে।

এই সময় ভারতের সর্বত্র শিল্পীসমাজ আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পের দ্বারা প্রভাবান্বিত। এই কারণে কলাভবনে আধুনিক মনোভাবাপন্ন ছাত্রছাত্রীর অভাব ছিল না। ক্লাসের বাইরে ঘরে বসে এইসব ছাত্র আধুনিকতার চর্চা করতেন। যে আধুনিকতার সংস্পর্শ থেকে কলাভবনের পাঠ্যক্রম এড়িয়ে চলেছিল সেইটি অন্তরালে থেকে বৃদ্ধি পেতে লাগল। এই সমস্যা সম্বন্ধে অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকমণ্ডলী নূতন করে চিন্তা করার প্রয়োজনবোধ করলেন না।

শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে বহু সমস্যা দেখা দেওয়া সত্ত্বেও কলাভবনের জীবন-যাত্রার মধ্যে সে সময় কোনো বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় নি। ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে সৌহার্দ্য, উৎসবে ও ভ্রমণকালে সহযোগিতার পথে কাজ করার অভ্যাস-গুলিকে সজীব ও সক্রিয় রাখার পথে তৎকালীন অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকবৃন্দের অবদান স্মরণীয়। নিঃসন্দেহে বলা চলে যে রবীন্দ্র-বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত কোনো বিভাগ এই সময় কলাভবনের তুল্য সংঘবদ্ধ জীবনযাপন করে নি। এই সংঘবদ্ধ জীবনযাত্রা সম্ভব হয়েছিল বলেই কলাভবনের পাঠ্যক্রমের ত্রুটি-বিচ্যুতি কর্তৃপক্ষ লক্ষ্য করেন নি।

১৯৬১ সালে রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উপলক্ষে বিশ্বভারতীর সংগঠনমূলক কাজ নূতন উদ্যমে শুরু হয়, উপাচার্য সুধীরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে। এই সময় কলাভবনের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন বিশ্বরূপ বসু।[১]

বিপুল অর্থব্যয়ে বিশ্বভারতীর প্রয়োজনীয় ঘরবাড়ি নির্মিত হয় এবং বহু দিনের জলকষ্ট দূর হয়। নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী কলাভবনের নন্দন শ্রীসদনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই পরিবর্তনের কালে কর্তৃপক্ষ কলাভবনের

১ বিশ্বরূপ বসুকে অস্থায়ী অধ্যক্ষ করা হয়। কলাভবনের আভ্যন্তরীণ কোনো পরিবর্তন করার অধিকার তাঁর ছিল না। তাঁর প্রধান দায়িত্ব ছিল শতবার্ষিকী উপলক্ষে উৎসব, অভিনয় ইত্যাদির পরিচালনা।

অধ্যক্ষ ও কর্মীবৃন্দের মতামত গ্রহণ করেন নি।[১] অবশ্য উপাচার্যের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নূতন নন্দন গৃহ 'নবনন্দন' নির্মিত হয় এবং ভি. আর চিত্রা অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন।[২]

নন্দলালের অবসর গ্রহণের পর থেকে কলাভবনে ডিগ্রী কোর্স চালু করার জল্পনা-কল্পনা চলছিল, কিন্তু মৌখিক আলোচনার বাইরে এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নি। উপাচার্য সুধীরঞ্জনের সময় এ বিষয়ে নূতন করে চিন্তা শুরু হয় এবং ১৯৬৫ সালে উপাচার্য ডক্টর কালিদাস ভট্টাচার্যের উদ্যোগে ডিগ্রী কোর্স সম্বন্ধে প্রথম আলোচনা সভা আহূত হয়।

কলাভবনের অধ্যক্ষ, দুইজন অধ্যাপক এবং পাঁচজন নিমন্ত্রিত সভ্য দ্বারা গঠিত ছিল এই সভা। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বয়ং উপাচার্য।

আচার্য নন্দলাল-প্রবর্তিত আদর্শ অক্ষুণ্ণ রেখে ডিগ্রী কোর্স চালু করা সম্ভব কি না এইটি ছিল আলোচনার মুখ্য বিষয়। নন্দলালের অবর্তমানে কলাভবনের পাঠ্যক্রমের পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সভ্যদের মধ্যে কোনো মতভেদ ঘটে নি। বিশেষভাবে নন্দলালের অবর্তমানে যে ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল সেইটির উপযোগিতা সম্বন্ধে অধিকাংশ সভ্য সন্দেহ প্রকাশ করেন।

ভিত্তিচিত্র, গ্রাফিক ও মূর্তিকলা ইত্যাদি যে-সব বিষয় কলাভবনে প্রথম চর্চা শুরু হয় সেগুলির যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে নানা শিক্ষাকেন্দ্রে। কিন্তু কলাভবনে এই বিষয়-সংক্রান্ত শিক্ষার কোনো উন্নতি ঘটে নি। এ সম্বন্ধে সভ্যবৃন্দ অনুসন্ধান করার কথা বলেন। ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও নন্দলাল প্রবর্তিত শিক্ষা-পদ্ধতি পরিমার্জিত করে পুনঃপ্রবর্তনের সিদ্ধান্ত হয় এবং ডিগ্রী কোর্স চালু করার পথে নানা সমস্যার আলোচনা করেন সভ্যবৃন্দ।

১ সম্প্রতি নন্দন অবশ্য কলাভবনকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং গ্রাফিক ও শিল্প-ইতিহাস এই দুটি বিভাগ সেখানে কাজ শুরু করেছে।

২ যে কোনো কারণেই হোক বিশ্বভারতীর কর্ণধার যাঁরা তাঁরা মনে করেছিলেন যে ভালো অভিজ্ঞ পরিচালকের দ্বারা কলাভবনের সমস্যার সমাধান হবে। এই কারণেই পরিচালনায় অভিজ্ঞ ভি. আর চিত্রাকে নিযুক্ত করা হয়। পরিচালনার আতিশয্যে কলাভবনের জীবনযাত্রা আরো জটিল হয়ে ওঠে।

ডিগ্রী কোর্স সংক্রান্ত দ্বিতীয় আলোচনা-সভা আহূত হয় ১৯৬৬ সালে। নন্দলাল-প্রবর্তিত ডিপ্লোমা কোর্স, সার্টিফিকেট কোর্স সমান্তরাল গতিতে চালু রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং ১৯৬৭ সালে অধ্যক্ষ দিনকর কৌশিকের অধীনে ডিগ্রী কোর্স চালু হয়।[১]

ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তনের ফলে পাশ্চাত্য শিল্পের প্রভাবে কলাভবনের ঐতিহ্য আচ্ছন্ন হতে পারে— এই আশঙ্কা অনেকের মনে দেখা দিয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনভূমিরূপে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই আদর্শ অনুযায়ী কিভাবে কলাভবনের শিক্ষার বিকাশ ও বিবর্তন ঘটেছে সে আলোচনা ইতিপূর্বে আমরা করেছি। এই মুহূর্তে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে দূরত্ব বহু পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। স্বাধীনতা অর্জনের মুহূর্ত থেকে ভারতের জীবনযাত্রাকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার চেষ্টা সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়[২] এই পরিস্থিতিতে জাতীয় ঐতিহ্যের শুদ্ধতা রক্ষা করা অপেক্ষা নূতন যুগের উপযুক্ত করে সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থাকে গড়ে তোলা ছাড়া অন্য পথ নেই— এ কথা নূতন করে বলার প্রয়োজন দেখি না। কলাভবনের নূতন পরিকল্পনাগুলির সার্থকতা অনুভব করতে হলে স্বাধীন ভারতের শিল্পশিক্ষার নূতন পরিকল্পনা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া দরকার।

১ এই সময় U. G. C.র সভ্যবৃন্দ বিশ্বভারতী পরিদর্শনে আসেন। তাঁদের সঙ্গে বিশেষজ্ঞরূপে ছিলেন বরোদা স্কুলের মূর্তিকলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নরনারায়ণ চৌধুরী (শঙ্খ চৌধুরী)। কলাভবনের নূতন পরিকল্পনাকে কার্যকরী করে তুলতে হলে যে অর্থের প্রয়োজন সে সম্বন্ধে নরনারায়ণ চৌধুরী সভ্যবৃন্দকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দেন এবং উপযুক্ত অর্থ পাওয়া সহজ হয়।

২ সাহিত্য, সমাজ, জীবনযাত্রার সকল অংশে, আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুপ্রবেশ যখন ঘটেছে সেই সময় শিল্পধারাকে এই প্রভাব থেকে রক্ষা করার ব্যর্থতা সম্বন্ধে নন্দলালের ছাত্ররাই প্রথম সচেতন হয়েছিলেন। তাঁদেরই সমর্থনে কলাভবনের নূতন পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই কারণে নূতন পরিকল্পনা নন্দলালের শিক্ষানীতি থেকে বিচ্ছিন্ন না বলে বিবর্তন বলাই সংগত।

৬

নবতম পরীক্ষা-নিরীক্ষা

কোনো একটি বিষয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পরিচয় পেতে হলে বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা দরকার। এ পর্যন্ত শিল্পশিক্ষা* সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হয়েছে তার সাহায্যে এই বিষয়ে সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় নি। যে সমাজে শিল্প-শিক্ষার বিধিব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল সে সম্বন্ধে আরো দু-এক কথা বলা দরকার। পাশ্চাত্য প্রভাব থেকে আত্মরক্ষা ও জাতীয় পরম্পরাকে আয়ত্ত করার ইচ্ছা ও চেষ্টা থেকেই শিল্পশিক্ষার নব পর্যায় দেখা দিয়েছিল।

যে সময় জাতীয় আদর্শের ভিত্তিতে শিল্পশিক্ষার উদ্‌যোগ-আয়োজন শুরু হয় সে সময় পাশ্চাত্য প্রভাবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ নিস্তেজ হয় নি। বরং ধীরে ধীরে এই প্রভাব দেশের মধ্যে নূতন পথে নূতন ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম ভারতীয় শিল্পশিক্ষার আদর্শ আধুনিক কালের পটভূমিতে স্থাপিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই আদর্শ পদে পদে বাধা পেয়েছে। সেই ইতিহাস ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি।

দীর্ঘকাল পর্যন্ত এ দেশের শিল্পী ও শিল্পরসিকরা মনে করতেন যে জাতীয় শিল্পের আন্দোলনের সাহায্যে পাশ্চাত্য শিল্পের প্রভাব থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হবে। কিন্তু এই আশা সফল হয় নি।

প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে পাশ্চাত্য শিল্পের প্রভাব প্রবলতর শক্তিতে দেশের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। বিভিন্ন ইজ্‌ম সম্বন্ধে চর্চা শুরু হয় এবং একটি নূতন শিল্পীগোষ্ঠী ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। একমাত্র কলাভবন ছাড়া ভারতে অন্য কোনো শিক্ষাকেন্দ্র তখন এই নূতন ভাবধারা সম্বন্ধে সচেতন হয় নি এই কারণে যে-সব শিল্পীরা নূতন শিল্প-আদর্শের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন এই ভাবধারা পরিপাক করার মতো প্রাথমিক বনেদ তাঁদের তৈরি হয় নি। মতি-মেজাজ অনুযায়ী অনুকরণ করতে তাঁরা বাধ্য হয়েছিলেন। আর-একটু পরিষ্কার করে বলা যায়: এই নূতন ভাবধারাকে কলাভবনের শিল্পীরা কিভাবে আত্মস্থ করার চেষ্টা করেছিলেন যথাস্থানে তার উল্লেখ করেছি। স্মরণ থাকতে

পারে যে ক্রামরিশের বক্তৃতা ও বিশ্বভারতীর সার্বজনীন পরিবেশ এই ভাবধারা আত্মীকরণে সবিশেষ সাহায্য করেছে।

অপর দিকে কলকাতা শহরে ও আর্টস্কুলের কিছু কিছু শিল্পীদের মধ্যেও একই ভাবধারা সংক্রামিত হয়। তবে তফাৎ এই যে দুর্ভাগ্যক্রমে আর্টস্কুলের ছাত্রদের পক্ষে 'ইজ্‌ম'-এর জটিল চিন্তাধারা সম্বন্ধে পৃষ্ঠভূমি তৈরি হওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। কাজেই কিউবিজ্‌ম ইত্যাদির প্রতি আকৃষ্ট হলেও এদের বাহ্যিকরূপ অনুকরণ ছাড়া এঁদের গত্যন্তর ছিল না। আমাদের আলোচ্য সময়কালে তাই বিদেশী বিশেষ করে ফরাসী প্রভাব দুই পথে ক্রিয়া করে— একটি আত্মীকরণ অপরটি অনুকরণ।

ক্রমশ কলকাতা শহরে ও পরে বোম্বাই ইত্যাদি শহরে অধ্যক্ষ জেরার্ডের প্রভাবে (১৯৩০) ইমপ্রেশনিস্টদের ঢেউ এসে লাগে। এ প্রসঙ্গে Calcutta Group-এর প্রভাবের কথাও উল্লেখ করতে হয়। আধুনিক আদর্শ ও ভাবধারাকে লক্ষ্য করে Calcutta Groupই প্রথম একটি গোষ্ঠী গড়ে তোলে।

যে-সব শিল্পীরা নূতন শিল্পচর্চায় আত্মনিয়োগ করার চেষ্টা করলেন তাঁদের একদল শিক্ষা পেয়েছিলেন সরকারি আর্টস্কুলে, অন্যদল নন্দলাল-প্রবর্তিত শিক্ষা-আদর্শের দ্বারা প্রভাবান্বিত। ক্রমে ফরাসী প্রভাব থেকে মার্কিন দেশের প্রভাব স্পষ্টতর হয়ে দেখা দিল। ফরাসী প্রভাবে যখন দেশীয় শিল্পীরা যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হয়েছেন এবং আধুনিকতার চূড়ান্ত নিদর্শনরূপে যখন শেজান, পিকাসো আদি শিল্পীরা আদর্শ হিসাবে গৃহীত হয়েছেন ও তাঁদের অনুকরণ ও অনুসরণের যখন একটা সামগ্রিক প্রচেষ্টা চলেছে সেই গতিতে পরিবর্তন আনল মার্কিন প্রভাব এবং স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই এই পরিবর্তনটি সংঘটিত হল।

এইভাবে এ দেশে পাশ্চাত্য-শিল্পের তিনটি স্তর গড়ে উঠেছে, মাঝে অনুপ্রবেশ করেছে ভারতীয় শিল্প-আদর্শের অপর একটি স্তর। প্রথমেই আর্টস্কুলের শিক্ষাকে অবলম্বন করে শিল্প (Industry)-সুলভ প্রয়োগ-বিদ্যার (technology

ব্রিটিশ আদর্শ দ্বিতীয় স্তরে এসেছে ফরাসী সাহিত্য প্রভাবান্বিত ভাবধারার ঢেউ, তৃতীয় স্তরে প্রকৃতি, নৃত্য-গীত অভিনয়কে অবলম্বন করে রূপনিষ্ঠ, বর্ণাঢ্য রেখানির্ভর ভারতীয় শিল্পাদর্শের প্রকাশ, চতুর্থ স্তরে অর্থাৎ সমকালীন আদর্শে আবার মার্কিন প্রয়োগ-বিস্তার (technology) পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভূমিকাটি মুখ্য।

কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে এই বিভিন্ন স্তরের মধ্যে যোগসূত্র থেকেছে অল্পই।

স্বাধীনতা অর্জনের মুহূর্ত থেকে ভারতের শিক্ষার ক্ষেত্রে বড়ো রকমের পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। দেশের আমূল সংস্কারের পথে ভারতবর্ষকে উন্নততর করে তোলাই বর্তমানের সমস্যা। এই সমস্যা সমাধান করতে হলে দেশকে পাশ্চাত্য সভ্যতার উপাদানের সাহায্যে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার দিকেই নেতারা দৃষ্টি দিয়েছিলেন। পশ্চিমের অবদান বর্জন অপেক্ষা গ্রহণ করাই হল স্বাধীন ভারতের মূল মন্ত্র।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবাসীর চিন্তা ও কর্মের সঙ্গে স্বাধীন ভারতের কর্ম ও চিন্তার পার্থক্য ঘটল অনেকখানি। জাতীয়তা অপেক্ষা আন্তর্জাতিকতা, বর্জন অপেক্ষা গ্রহণ, এবং আধ্যাত্মিক উপলব্ধি অপেক্ষা জীবনযাপনের আনুষঙ্গিক উপকরণ সংগ্রহের দিকেই ভারতবাসী দৃষ্টি দিলেন।

Faculty of Fine Arts, Boroda

নূতন পরিস্থিতিতে শিল্পশিক্ষার নূতনতম অধ্যায় দেখা দিল বরোদা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত কলাবিভাগে (Faculty of Art)। যাঁরা এই শিল্পকেন্দ্রের শিক্ষা-সংক্রান্ত পরিকল্পনা করলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মারকণ্ড ভট্ট, এন. বেন্দ্রে, নরনারায়ণ চৌধুরী ও কে. জি. সুব্রহ্মন্যম্। এন. বেন্দ্রে ব্যতীত সকলেই ভারতীয় পদ্ধতিতে শিক্ষা পেয়েছেন। শান্তিনিকেতনের শিক্ষার সঙ্গে সকলেই ছিলেন ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। এই কারণে ভারতীয়

পদ্ধতিতে শিক্ষা দেবার সিদ্ধান্ত সহজেই এঁরা গ্রহণ করেছিলেন। ক্রমে সকলেই অনুভব করলেন যে আধুনিক কালের সমস্যাগুলি পূরণের পক্ষে একান্তভাবে ভারতীয় পদ্ধতি যথেষ্ট নয়। পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতির কিছু গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বউহাস শিক্ষাকেন্দ্রের আদর্শের সঙ্গে ভারতীয় পদ্ধতির সংযোগ স্থাপনের পথে বরোদায় শিক্ষার আদর্শ গড়ে উঠেছে।

বউহাস (Bauhaus) শিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রমুখ আচার্যদের প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতির কিঞ্চিৎ তুলনামূলক আলোচনা করার প্রয়োজন। বউহাস শিক্ষাপদ্ধতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতার উজ্জ্বল প্রমাণ। আধুনিক শহরে, যন্ত্রশক্তি, সভ্য মানুষের জীবনযাত্রার সমস্যা সম্বন্ধে বউহাস পদ্ধতি বিশেষ সচেতন। যন্ত্রদ্বারা ব্যক্তিজীবন সংকীর্ণ ও নিস্তেজ হয়ে আসবে এ আশঙ্কা বউহাস আদর্শের ধারকরা পোষণ করতেন না, বরং তাঁরা মনে করতেন যে যন্ত্রশক্তিকে আয়ত্ত করার পথেই আধুনিক সভ্যতার মুক্তি। ব্যক্তিনির্ভর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা-বোধ তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট ছিল। 'শিখিয়ে পড়িয়ে আর্টিস্ট করা যায় না'— অবনীন্দ্রনাথের এই উক্তির সঙ্গে বউহাসবাদী শিল্পীগোষ্ঠীর মতের কোনো পার্থক্য ছিল না। অপর দিকে তথাকথিত উচ্চাঙ্গের শিল্প ও কারিগরির মধ্যে সংযোগ স্থাপনের পথ তাঁরা অনুসন্ধান করেছিলেন। নন্দলালের মতও এ বিষয়ে ভিন্ন ছিল না। তবে তফাৎ এই যে নন্দলাল যন্ত্রযুগের বিভিন্ন অবদান গ্রহণ করেন নি।

পরম্পরার সঙ্গে নব্যকালের সম্বন্ধ-স্থাপনের পথ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বউহাস আদর্শবাদীরা লক্ষ্য করলেন যে অতীতের সামাজিক সমস্যা ও বর্তমানের জীবনযাত্রা, বুদ্ধি-বিচার ও অনুভূতির ক্ষেত্রে নূতন চেতনার পার্থক্য অনেক। এই কারণে পরম্পরার ব্যাখ্যা তাঁরা করলেন ব্যাপক অর্থে এবং এই ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা-বোধ থেকেই শিল্পীদের পক্ষে ইতিহাস-চর্চার প্রয়োজনীয়তা-বোধ জাগল।

বউহাস শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থার মূলগত সম্বন্ধ লক্ষ্য করা দুরূহ নয়। অবশ্য প্রধান পার্থক্য আধুনিক সভ্যতার তাৎপর্য

বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে। তুলনামূলক আলোচনার পথে সিদ্ধান্ত করা চলে বরোদা শিল্পকেন্দ্র যে ভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতি সংযোগ স্থাপনের প্রয়াস করলেন সেটি কলাভবনের শিক্ষাব্যবস্থারই উজ্জ্বল প্রক্ষেপ ও নূতনতর বিবর্তন।

বরোদায় ছাত্ররা প্রথম বৎসর সংক্ষিপ্ত পাঠক্রমের পথ অনুসরণ করেন। দ্বিতীয় বৎসরে ছাত্ররা চিত্রকলা, মূর্তিকলা, ব্যবহারিক শিল্প, ইতিহাস ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ পথ গ্রহণ করেন। উপাধি-পরীক্ষার জন্য ইতিহাস, শিল্প সমালোচনা আবশ্যিক। ডিপ্লোমা কোর্সে পাঠ্যবিষয় আবশ্যিক নয়। উপাধি, ডিপ্লোমা কোর্স ও সার্টিফিকেট কোর্স তিন ধারায় এই শিক্ষা।

দেশী ও বিদেশী পদ্ধতির মধ্যে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার চেষ্টা এই শিক্ষাকেন্দ্রে প্রথম থেকেই ছিল না। উভয় দিকের ঐতিহ্যকে তাঁরা সমান মূল্য দেবার চেষ্টা করেছেন এবং সমন্বয়ের পথ অনুসন্ধান করেছেন। নানা পরম্পরার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন মননশীলতা। এই কারণে বরোদা শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বিচার-বিশ্লেষণের পথ তাঁরা মুক্ত রাখার চেষ্টা করেছেন।

ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার শিল্পশিক্ষার একটি পরিকল্পনা উপস্থিত করেন (১৯৫০)। এই পরিকল্পনার মধ্যে অভাবনীয় কিছু নেই। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে কেন্দ্রীয় সরকার প্রবর্তিত শিল্পের পাঠ্যক্রমে পরীক্ষার ফলাফল অপেক্ষা শিল্পীর মৌলিকতাকে প্রধান করে দেখা হয়েছে।

বরোদা ও কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পিত শিল্পশিক্ষার পাঠ্যক্রমে প্রধানত আধুনিক যুগের বিশেষ সমস্যার দিকে লক্ষ রাখা হয়েছে। যে সমস্যাগুলি সম্বন্ধে উপরের উল্লিখিত পাঠ্যক্রম-সচেতন সেই সমস্যাগুলি সমাধানের জন্যই কলাভবনের পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন করতে হয়েছে। শিল্পশিক্ষার বহু সমস্যা নন্দলাল পূরণ করেছিলেন। কিন্তু আধুনিক কালের দাবি গ্রহণ না করার ফলে একটি বড়ো রকমের সমস্যার সমাধান হয় নি। আজ এই সমস্যা আরো গভীর এবং উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। আধুনিকতার প্রভাবে ভারতীয় ঐতিহ্য নির্মূল হয়ে যাবে এ কল্পনা করার দিন চলে গেছে। কালধর্ম যেমন উপেক্ষা করা চলে না তেমনি আধুনিক শিল্পের অবদান সম্বন্ধেও আজ উদাসীন থাকা সম্ভব নয়।

আধুনিকতাকে জানবার পথে অনেকগুলি উপায় বরোদা শিল্পকেন্দ্র শিল্পীদের সামনে উপস্থিত করেছেন। কেন্দ্রীয় শিল্পশিক্ষা পরিকল্পনাতে তার সমর্থন পাওয়া যায় এবং শান্তিনিকেতনের নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থা সেই পথেই অগ্রসর হয়েছে। একই সঙ্গে দেখা দিয়েছে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পবিভাগের কার্যসূচী।

এক সময় ইংরাজ-প্রবর্তিত শিল্পশিক্ষার দ্বারা আমরা বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। দেশের ঐতিহ্য ভুলেছিলাম বলে আজকের দিনের পরিকল্পনাকে পাশ্চাত্য অনুকরণের মোহ বলে বর্জন করার চেষ্টা যেমন ব্যর্থ তেমনই নিরর্থক। কারণ বর্তমান কালের পাশ্চাত্য শিল্প ও প্রাচ্য শিল্পের মধ্যে পার্থক্য অল্পই। অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্প গড়ে উঠেছে প্রাচ্য শিল্পের উপাদানের সংযোগে। এই সঙ্গে আছে বৈজ্ঞানিক যুগের অবদান। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ নানা দিক দিয়ে পিছিয়ে ছিল। স্বাধীন ভারত এই পথে আজ অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে। এই অগ্রগতির পথে পশ্চিমের সমস্যাগুলিও দেখা দিয়েছে এবং দেখা দেবে। পরিণাম শুভ কি অশুভ হবে সে প্রশ্ন অবশ্যই আছে। তবে যে অবস্থায় আমরা এসে পৌঁচেছি তার উপযুক্ত ব্যবস্থারও দরকার আছে। শিল্পশিক্ষার নূতন পরিকল্পনা কালধর্মের প্রকাশ। কোনো ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছাধীনে এই পরিবর্তন ঘটে নি।

শিল্পশিক্ষার গতি-প্রকৃতি আজ যাঁদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে চলেছে তাঁদের সকলেরই শিক্ষা বৈজ্ঞানিক যুগের পরিবেশে। প্রায় সকলেই ইউরোপ আমেরিকা-প্রত্যাগত এবং সে দেশে হাতে-কলমে শিক্ষা করবার সুযোগও অনেকের ভাগ্যে ঘটেছে। উনবিংশ শতাব্দীর ভাবধারা প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে। পাশ্চাত্য প্রভাব একটা সাময়িক ঘটনা অপেক্ষা নূতন শক্তির প্রতীকরূপে আজ আমাদের সামনে উপস্থিত। কাজেই চিন্তা ও কর্মে নব্যশিল্পী ও শিক্ষাব্রতীরা যে উনবিংশ শতাব্দীর ভাবধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন এতে বিস্মিত হবার কারণ নেই। বিবর্তনের এই হল স্বাভাবিক গতি।

নূতন আচার্যদের অধীনে নবপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষাকেন্দ্রগুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে

সিদ্ধান্ত করার সময় এখনো আসে নি। কেবলমাত্র দিক-পরিবর্তন সম্বন্ধে পরিচয় নেওয়া যেতে পারে।

ষ্টিললাইফ, লাইফ-স্টাডি, পারস্পেকৃটিভ ইত্যাদি বিষয়গুলির শিক্ষাদানের ব্যবস্থা পূর্বেও ছিল তবে আজ এইগুলির চর্চা চলেছে নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে। এই মুহূর্তে বস্তুরূপের যথাযথ অনুকরণ শিল্পচর্চার প্রধান লক্ষ্য নয়। শিল্পরূপ নির্মাণের আনুষঙ্গিক রূপে উপরের বিষয়গুলি প্রবর্তিত হয়েছে নূতন আদর্শের শিল্পকেন্দ্রগুলিতে। এই দিক দিয়ে আজকের দিনের ছাত্রদের স্বাধীন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ পুরাতন আর্টস্কুলের চেয়ে অধিক। অভ্যাসের পথে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি আয়ত্ত করা ও স্বকীয় শিল্পবোধের উপযুক্ত করে লব্ধ বিষয়গুলির প্রয়োগ বর্তমান শিল্পশিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষকদের দায়িত্ব অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। সৃষ্টিবিমুখ পেশাদার শিক্ষকের পক্ষে নূতন আদর্শের শিক্ষাকেন্দ্রের পরিচালনা সম্ভব নয়। আধুনিকতম শিক্ষা-প্রণালীর সঙ্গে কলাভবনে নন্দলাল প্রবর্তিত শিক্ষানীতির সংঘাত অপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ লক্ষ্য করার বিষয়। এ দিক দিয়ে কলাভবনের ঐতিহ্য নূতন শিক্ষাপদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত করার পক্ষে অনেক পরিমাণে অনুকূল।

নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী পরীক্ষার ব্যবস্থা তিন ভাগে বিভক্ত; যথা— হাতে-কলমে কাজের পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা ও মৌখিক পরীক্ষা। প্রশ্নপত্র অনুযায়ী শিল্পকর্ম, সারা বছরের ক্লাসের কাজ এবং ছাত্রদের স্বাধীনভাবে করা কাজের নিদর্শন এই সঙ্গে উপস্থিত করা হয়। নিমন্ত্রিত পরীক্ষক ও বিভাগীয় শিক্ষকের সহযোগিতায় নম্বর দেওয়া ও শ্রেণীভাগ করা হয়। হাতে-কলমে কাজের পরীক্ষা করা হয় এইভাবে। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী ছাত্রদের করণ-কৌশলের জ্ঞান, পর্যবেক্ষণ শক্তি, নির্মাণ-দক্ষতা ও কল্পনাশক্তি পরীক্ষকরা অনুমানের চেষ্টা করেন। লিখিত পরীক্ষার সাহায্যে ছাত্রদের চিন্তাশক্তি জানবার সুযোগ ঘটেছে। মৌখিক পরীক্ষার সাহায্যে পরীক্ষকরা অনুমান করেন ছাত্রদের ধীশক্তি।

নূতন পরীক্ষা-ব্যবস্থার সাহায্যে ছাত্রদের শিল্পবোধ, আঙ্গিকের দক্ষতা অবশ্যই

জানতে পারা যায়। তবে সমস্যা এই যে বাৎসরিক পরীক্ষার পথে একটি সংস্কার অতি দ্রুতগতিতে গড়ে ওঠে। এই সংস্কারকে শিক্ষাকেন্দ্রের বিশিষ্টতা বলা চলে। আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির লক্ষ্য শিল্পীর স্বাধীনতা। পরীক্ষার ব্যবস্থা এই আদর্শের পরিপন্থী। এই সংঘাত থেকে কোনো শিল্পকেন্দ্রই আজ মুক্ত নয়। পরীক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব একসূত্রে গাঁথা। এই কারণে পরীক্ষার ব্যবস্থা এই মুহূর্তে দূর করা সম্ভব হবে না। পরীক্ষার বিধি-ব্যবস্থার আমূল সংস্কার না হওয়া পর্যন্ত শিল্পশিক্ষার সার্থক পরিণতি সহজ-সাধ্য নয়।

শিক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত আধুনিক শিল্পশিক্ষার সুপরিণতি সহজে আসবে না— এই সমস্যামূলক উক্তির উপযুক্ত জবাব দেওয়া ততোধিক কঠিন। এই মুহূর্তে পৃথিবীর নানা স্থানে নানাভাবে পরীক্ষাসমস্যা নিয়ে সমাধানের যে-সমস্ত চেষ্টা চলেছে তার পটভূমিতে মতামত দেওয়া যেতে পারত কিন্তু সে আলোচনা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। কাজেই দেশের সমস্ত অবস্থা-ব্যবস্থার কথা মনে রেখে কতটুকু সংস্কারসাধন এখনি করা চলে প্রধানত সেই দৃষ্টি নিয়ে কিছু ব্যক্তিগত মন্তব্য উপস্থিত করছি।

শুধু অভিজ্ঞ শিক্ষকরাই নয়, সাধারণভাবে প্রায় প্রত্যেকেই লক্ষ্য করেছেন যে বর্তমান ব্যবস্থায় পরীক্ষার ফলাফলের শ্রেণীকরণের যে বিধি আছে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবনের কাজে তার প্রতিফলন থাকে না বললেই চলে। প্রথম শ্রেণীতে সম্মানিত ছাত্র কাজ করা একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন এমন দৃষ্টান্ত যেমন যথেষ্ট আছে তেমনি নিতান্ত সাধারণভাবে পাস করা ছাত্র কাজের মধ্য দিয়ে কৃতী হয়েছেন এমন দৃষ্টান্তও বড়ো কম নেই। একমাত্র চাকুরিস্থলের নির্বাচনকে সহজ করা ছাড়া শ্রেণীকরণের বোধ হয় অন্য কোনো সার্থকতা নেই।

এখন বিনা তর্কে আর-একটি কথা আমরা মেনে নিতে পারি যে আধুনিক পরীক্ষা-ব্যবস্থা অভ্যাসগত পরাকাষ্ঠা নির্ণয়ের যন্ত্রমাত্র। অথচ অভ্যাসগত দক্ষতা শিক্ষার লক্ষ্য হতে পারে না, উপায়বিশেষ। অভ্যাসগত দক্ষতার পথে শিল্পীর সৃজনশীল বৃত্তির উন্মেষ ও বিকাশ হবে এটিই সর্বৈব বাঞ্ছনীয়।

এ কথাটি স্বীকারও করেন সকলে এবং সাম্প্রতিক কালে স্বকীয়তা, মৌলিকত্ত্বা (originality, creativity) ইত্যাদি শব্দগুলির বহুল ব্যবহারের মাঝেই বোঝা যায় আমরা এ সম্বন্ধে ক্রমেই সচেতন হচ্ছি। কিন্তু তৎসত্বেও পরীক্ষা-ব্যবস্থার গতানুগতিক কাঠামোর দৌলতে মান নির্ণয়ে অভ্যাসগত দক্ষতা অযৌক্তিক প্রাধান্য পেয়ে আসছে।

আবার ছাত্রছাত্রীদের কাজে মৌলিকতার মান নির্ণয় করার ব্যাপারটিও কম জটিল নয়, বিশেষ করে সেটি যখন অনেকগুলি পারিপার্শ্বিক কারণের উপর নির্ভরশীল। প্রধানতম অন্তরায় এই যে প্রশ্নপত্র দিয়ে কিংবা নির্দিষ্ট সময়কালে কাজের সময় বেঁধে দিয়ে আর যাই কিছু হোক, মৌলিকতা নির্ণয়ের আয়োজন করা চলে না।

মৌলিক রচনার ক্ষেত্রে মতিমেজাজেরও একটি বিশেষ স্থান আছে যেটি অভ্যাসগত কাজের ক্ষেত্রে একেবারেই নিষ্প্রয়োজন। মৌলিকতার জন্য মতি মেজাজ একাধারে সহায় এবং বাধা। প্রশ্নপত্রের বিষয় সম্বন্ধে একজন প্রতিভাবান ছাত্রের যদি তেমন কোনো উৎসাহ অনুপ্রেরণা না জাগে তা হলে তার কাজের মধ্যে তার প্রতিভার ছাপটি অনুপস্থিত থাকবেই এবং ফলাফলও তদনুরূপ সাধারণ হবে। এ ছাড়া পরীক্ষার্থীর সঙ্গে পরীক্ষকের মন মেজাজ রুচির বিভিন্নতাও যথার্থ মান নির্ণয়ে বাধা উপস্থিত করতে পারে। অভিজ্ঞ ও সচেতন পরীক্ষক যদিও এই বাধাকে অনেকখানি কাটিয়ে উঠতে পারেন তা হলেও সাধারণভাবে এ বাধাটুকু থেকেই যায় সর্বত্র।

দক্ষতা বা মৌলিকত্ব উভয়ের ক্ষেত্রেই সমান প্রযোজ্য। আর একটি সত্য এই যে বিবর্তনের পথেই তাদের সম্যক বিকাশ হয়। তা হলেও মৌলিক সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই বিবর্তনের সঠিক বিচার করা বাস্তবিকপক্ষেই অধিকতর জটিল। সাধারণ ছাত্রের দক্ষতা-নির্ভর বাঁধাপথ অনেক প্রতিবন্ধক, প্রতিকূলতা থেকেই তাঁকে রক্ষা করে। কিন্তু প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন ছাত্রদের নিত্য নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে অবলম্বন করে যে অভিযানবৃত্তি তার মধ্যে নিরন্তর উত্থান-পতনের নজিরটিই বেশি স্পষ্ট। কাজেই ভালো ছাত্রের কাজের মান নির্ণয় করতে

গেলে লঘু-গুরু বিচার হওয়ার সম্ভাবনাও ততোধিক বেশি। নীতিগতভাবে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা স্বীকৃতি পেলেও প্রচলিত ধারায় আর্টস্কুলে এই নীতিটির কোনো কার্যকর স্বীকৃতি নেই।[১]

মৌলিক সৃষ্টির ক্ষেত্রে আর একটি প্রতিবন্ধক হল আচার্যপ্রদত্ত শিক্ষাধারার প্রভাব। এই প্রভাব থেকে মুক্ত হতে না পারলে কোনো মৌলিক সৃষ্টিই সম্ভব নয়। তা হলে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রচলিত পরীক্ষা-ব্যবস্থা এবং শিক্ষকের ব্যক্তিগত ধারার প্রভাব মৌলিকত্ব প্রকাশের পথে দুটি সর্বপ্রধান অন্তরায়। আচার্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারলেই মৌলিক সৃষ্টির সূত্রপাত ঘটে। এই প্রভাব থেকে মুক্তি অতীব বাঞ্ছনীয়।

বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এগুলির কিছু সমাধানের ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা করছি। প্রথমত মাননির্ণয়ের ক্ষেত্রে মৌলিক রচনাকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং তার সঠিক পরিমাপ করার একটা প্রক্রিয়া উদ্‌ভাবন করতে হবে। দ্বিতীয়ত, বিবর্তনের পথেই শিল্পশিক্ষার্থীর জীবন এগিয়ে চলে এ কথা যদি আমরা স্বীকার করে নিই, তা হলে ছাত্রছাত্রীর সকল রকম কাজকেই মূল্য মর্যাদা দিতে হয় এবং সমস্ত কাজের সাহায্যেই তাঁর কৃতিত্বকে বিচার করতে হয়। এই প্রসঙ্গে বিদগ্ধ ধারণা এই যে, যে সমস্ত কেন্দ্রে সামগ্রিক কাজের প্রদর্শনীকে অবলম্বন করে বিচার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা চলেছে তাঁদের পদ্ধতি পুরাতন ব্যবস্থার চেয়ে অনেক বেশি সুষ্ঠু ও কার্যকর।

তৃতীয়ত বিভিন্ন মতানুসারী ও ভাবাদর্শের শিল্পীদের যদি দর্শক বা পরীক্ষক হিসাবে নিমন্ত্রণ করে মতামত গ্রহণ করা যায় তা হলেও পরীক্ষার্থীর মান-

১ মৌলিক সৃষ্টির মান-নির্ধারণের প্রচলিত প্রক্রিয়াটি কতখানি প্রহসনমূলক তা আমরা যে কোনো নাম-করা প্রদর্শনীর নির্বাচন-ব্যবস্থার দিকে তাকালেই বুঝতে পারব। সত্যিকারের কোনো পরিমাপের মান উপস্থিত থাকলে এক প্রদর্শনীতে না-নেওয়া (rejected) কাজ অন্য প্রদর্শনীতে সম্মানের সঙ্গে গৃহীত হত না অথবা এক বছরের না-নেওয়া কাজ অন্য বছরে সাদর-স্বীকৃতি পেত না। আর-একটি কথা, পাঠ্যক্রম, পরীক্ষা, মান-নিরূপণাদি নীতির মধ্য দিয়ে সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারী কোনো ছাত্রকেই উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না।

নির্ণয় প্রক্রিয়াটি অপেক্ষাকৃত ত্রুটিহীন হওয়ার সুযোগ পায়। প্রসঙ্গত, যদি আমরা বেসরকারি ও সওদাগরি প্রতিষ্ঠানের দিকে তাকাই তা হলে দেখব শিল্পী-নির্বাচনে আর্টস্কুলের মান-নির্ণয় পন্থা ও সরকারি নির্বাচন-প্রক্রিয়ার চেয়ে তাঁরা ভুল করেন অনেক কম। কারণ তাঁরা সার্টিফিকেট, শ্রেণীকরণ অপেক্ষা কাজ দেখেই শিল্পীর প্রতিশ্রুতি নির্ধারণের চেষ্টা করেন। তাই আবার বলি, শিল্পকেন্দ্রে শ্রেণীকরণের বর্তমান ব্যবস্থাটি নিতান্তই নিরর্থক।

এবার শিল্পশিক্ষা কেন্দ্রে পাস-ফেলের রেওয়াজটি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা দরকার। অভিজ্ঞ শিক্ষকমাত্রই লক্ষ্য করেছেন যে এমন কিছু ছাত্র থাকেন যাঁদের কতকগুলি সহজাত দুর্বলতা দূর করা কোনো বিশেষ শিক্ষাকেন্দ্রের পক্ষে সম্ভব নয়। জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই সে দুর্বলতা দূর হওয়ার সুযোগ হতে পারে— সে সুযোগ না এলে সে দুর্বলতা হয়তো জীবনভর থেকেই যায়। কাজেই অনুত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের দু-এক বছর আর্টস্কুলে রেখে দিলেই যে তাঁরা সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি কাটিয়ে উঠে উন্নতি করবেন এমন কোনো প্রমাণ আমরা এযাবৎ অন্তত আমাদের অভিজ্ঞতায় পাই নি। শিক্ষাকেন্দ্রে তাঁর প্রতি বিশেষ নজর দেওয়ার ব্যবস্থা থাকলে, আঙ্গিক শিক্ষার ক্ষেত্রে হয়তো কখনো কিছু উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে তা হলেও উন্নতি হয় বা হবে এ কথাটি জোর করে বলা চলে না। পাস-ফেলের ব্যাপারটি একান্তভাবে একটি প্রথাগত সংস্কারের অনুসরণ ছাড়া আর অন্য কিছু বলেই মেনে নিতে পারি না।

কাজেই শিল্পশিক্ষাকেন্দ্রে ছাত্রছাত্রীদের কাজের মান নিরূপণে পাস-ফেল ও শ্রেণীকরণের প্রথাটি বাদ দিতে পারলেই ভালো হয়। সাধারণভাবে তাঁদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করতে হলে তিনটি বিষয়ের প্রতি সমধিক নজর দেওয়া দরকার; প্রথমটি হল তাঁদের শিল্পচেতনা ও সৃজনীশক্তি, দ্বিতীয়ত আঙ্গিকগত দক্ষতা এবং তৃতীয়ত তাঁদের আগ্রহ-উদ্দীপনা। পাস-ফেলের অযৌক্তিক পথ না ধরে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের নির্দিষ্ট সময়কালের পর যদি বাস্তবক্ষেত্রে অথবা কর্মক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ দেওয়া যায় এবং তার জন্য যদি আর্টস্কুলগুলি এখন থেকেই সচেতন প্রচেষ্টা চালিয়ে যায় তা হলে

বোধ হয় সমস্যাটির কথঞ্চিৎ সমাধান মেলে। শিল্পশিক্ষাকেন্দ্রে আর-একটি সুব্যবস্থার আশু প্রয়োজন আছে। প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী হিসাবে তাঁরা যেন যে কোনো সময়ে এসে তাঁদের সমস্যা নিয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে পারেন— উপদেশ নিতে পারেন এবং প্রয়োজনে পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপযুক্ত সুযোগ পান।

ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ভেবে প্রসঙ্গত আর দু-একটি কথা বলা সমীচীন বোধ করছি। সকলেই জানেন প্রত্যেক আর্টস্কুলকে কেন্দ্র করে একটি সংস্কার গড়ে ওঠে। এই সংস্কারের প্রয়োজন অবশ্যই আছে আবার এটিকে ভাঙারও প্রয়োজন হয়। তা সম্ভব একমাত্র শিক্ষক-বিনিময়ের দ্বারা। সমস্ত আর্টস্কুলে পরস্পর শিক্ষক-বিনিময়ের প্রয়োজনের কথা সর্বত্র স্বীকৃত কিন্তু এখনো এটি কার্যকরী হয়ে ওঠে নি। ব্যক্তিগতভাবে ছাত্র-বিনিময়ের কথাটিও যোগ করতে চাই।

ছাত্ররা অন্য আর একটি স্কুলে কিছুদিনের জন্য আসতে পারলে তাঁদের নিজেদের স্কুলের মান, অবস্থা, অনুকূলতা অথবা প্রতিকূলতার সঙ্গে অপর স্কুলের তুলনাগত বিচার করে বাস্তব শিক্ষালাভ করতে পারেন। উপাধি-পরীক্ষার পর স্কুল থেকে বাইরে এসে তাবৎ বিপন্নতা বোধ এর থেকে কমে যেতে পারে। যদি এখনি সেটুকু সম্ভব না-ও হয় তা হলে অন্তত ছাত্রছাত্রীদের কাজের বিনিময় হওয়াটি খুবই দরকার। সমস্ত আর্টস্কুলে সব বিভাগে সমান মানের ও সমান ভাবধারার কাজ হয় না। কোথাও Life থেকে করা কাজ নিয়ে নানা ভাঙচুর, কোথাও বা মৌলিক রচনার প্রতি নজর বেশি। কাজের পারস্পরিক বিনিময়ে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের সঙ্গে অপরের তুলনাগত বিচার করে যে কার্যকরী শিক্ষা পেতে পারেন নিজেদের শিক্ষাকেন্দ্রের গণ্ডিতে তার সুযোগ কখনোই হতে পারে না।

আর-একটি কথা সম্যক উপলব্ধির সময় এসেছে। তা হল এই যে সমস্ত শিল্পশিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্র-শিক্ষক মিলে একটি বৃহৎ সমাজ। এই বৃহৎ সমাজের ধারণাটি (conception) আজ অনুপস্থিত বলেই উদীয়মান শিল্পীদের পদে

পদে আজ নানা বিভ্রান্তি। সমস্ত আর্টস্কুলকেই আজ এই দিকে লক্ষ্য রেখে সচেতনভাবে কাজ করে যেতে হবে যে কর্মজীবনে বা পেশাগত জীবনে প্রবেশ করার আগে ছাত্রছাত্রীরা যেন এই ধারণা নিয়ে যেতে পারেন যে তাঁরা বাস্তবিকভাবে একটি বৃহৎ শিল্পীসমাজেরই অংশ।

পরীক্ষা-সমস্যা ও শিক্ষণনীতি প্রসঙ্গে শেষ কথা শিক্ষকদের কাছে। আর্ট-স্কুলের বাঁধাধরা পাঠ্যক্রম শেষ করিয়ে দিলে তাঁদের কর্তব্য শেষ হবে না। ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার উপযোগী করে তুললেও তাঁদের দায়িত্ব স্খালন হয় না। নিজেদের নিরন্তর কাজের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই তাঁরা ছাত্র-সমাজের কাছে আদর্শ স্থাপিত করতে পারেন, অনুপ্রাণিত-উৎসাহিত করতে পারেন। তাঁরা কাজ না করলে শত মনোজ্ঞ বিধিব্যবস্থা সত্ত্বেও শিল্পী তৈরির কোনো পরিবেশই গড়ে উঠতে পারে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও শৃঙ্খলার আওতায় শিল্পকেন্দ্রগুলিতে সুবিধেও যেমন অসুবিধেও যথেষ্ট। সকল ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞ বিচক্ষণ শিল্পীকে অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু দপ্তরের কাগজপত্র এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করতে গিয়ে অভিজ্ঞ অধ্যক্ষ ছাত্রদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং অধ্যক্ষের অভিজ্ঞতা প্রায় সময়ই কোনো কাজে আসে না। এই ত্রুটি দূর করার জন্য আবর্তনের গতিতে (rotation) অধ্যক্ষ নিযুক্ত করার ব্যবস্থা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকার পুরাতন আর্টস্কুলগুলির সংস্কার না করলেও শিল্পশিক্ষার উন্নতিকল্পে অনেকগুলি পরিকল্পনা উপস্থিত করেছেন। প্রতিভাবান ছাত্রদের গবেষণার ব্যবস্থা এই পরিকল্পনার অন্যতম অবদান। নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী উপাধি বা ডিপ্লোমা-প্রাপ্ত ছাত্ররা নিজেদের নির্বাচিত অভিজ্ঞ শিল্পীর কাছে এক বছর বা তার অধিককাল কাজ করার সুযোগ পেয়েছে। স্বাধীনভাবে নিজ নিজ বিষয় পরীক্ষা করবার সুযোগ দেওয়াই এই-সব বৃত্তির লক্ষ্য। বৃত্তি-ভোগীদের পরীক্ষা দিতে হয় না। আচার্যের মতামত এক্ষেত্রে চূড়ান্ত বলে মেনে নিয়েছে সরকার।

সকল শিল্পকেন্দ্রে সমান অভিজ্ঞ শিক্ষক পাওয়া যায় না এই ত্রুটি দূর করবার জন্য নিমন্ত্রিত বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করার ব্যবস্থা নবপ্রতিষ্ঠিত শিল্পকেন্দ্রে প্রবর্তিত হয়েছে। এই ভাবে বিভিন্ন শিল্পীর সাহচর্য পাওয়ার সুযোগ ছাত্র ও অধ্যাপকরা পেতে পারেন। বিদেশে শিক্ষার জন্য বৃত্তির অভাব নেই।

শিল্পকেন্দ্রের নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম অনুসরণের মধ্যেও যেমন স্বাধীনতা আছে তেমনি বিভিন্ন শিল্পীর সান্নিধ্য পাবার পথ পূর্বের চেয়ে আজ অনেক পরিমাণে মুক্ত ও প্রশস্ত। এই পরিস্থিতিতে পরীক্ষার স্থান কতটুকু এবং কিভাবে সেই পরীক্ষা পরিচালিত করা হবে এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে না পৌছানো পর্যন্ত আধুনিক শিল্পকেন্দ্রে নূতন বিধিব্যবস্থার উপযুক্ত বিকাশ সহজসাধ্য নয়।

শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্রে যে নূতন আদর্শ দেখা দিয়েছে সে ক্ষেত্রে বুদ্ধি-বিচারের স্থান অল্প নয়। বুদ্ধি-বিচারের উপাদান প্রায় সকল ক্ষেত্রেই আমাদের সংগ্রহ করতে হয়েছে পাশ্চাত্য দেশগুলি থেকে। নব্য ভাবাপন্ন শিল্পীমাত্রই জানেন যে আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্প প্রাচ্য শিল্পের উপাদানে গঠিত। শিল্পীদের এমন অনেক উপলব্ধির কথা আমরা জানি যেগুলির সঙ্গে ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে জানবার পথ কিছুমাত্র সুগম হয় নি। কয়েকটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ শিল্পী ও শিল্পশিক্ষক ভারতীয় শিল্পের চর্চা করার সুযোগ অনুসন্ধান করেন না। এ কথা বলা চলে যে স্বাধীনভাবে ভারতীয় প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য শিল্প সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এদেশে অল্পই হয়েছে। ইউরোপ আমেরিকা বিপুল শক্তিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা যা করেছে তাদের সিদ্ধান্ত বিচার বিশ্লেষণ করে দেখবার চেষ্টাও এ দেশে বেশি হয় নি।

চিন্তার উপাদান গ্রহণ করতে হলে প্রত্যেককে বিষয়টি সম্বন্ধে নিজের শক্তি অনুযায়ী চিন্তা করে গ্রহণ করতে হয়। অন্যথায় আমরা ভারবাহী হয়ে থাকি, নূতন বিষয়ের দ্বারা নিজেদের শিক্ষিত করে তুলতে পারি না।

ইউরোপ আমেরিকার পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিপুল ফলাফল আমাদের গ্রহণের পথ মুক্ত হয়েছে বলে আপ্তবাক্য বলে সব কিছুকে গ্রহণ করবার চেষ্টা করলে পুনরায় আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর সংকীর্ণতা দ্বারা আচ্ছন্ন হব। এই কারণে

এই বিপদ থেকে আত্মরক্ষার উপায় স্বাধীনভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার উদ্যম ও উপযুক্ত জ্ঞান।

পাশ্চাত্য প্রভাবের কথা দিয়ে এই আলোচনা আমরা শুরু করেছিলাম। প্রায় একশো বছর পরে পুনরায় পাশ্চাত্য শিল্পের কথায় এসে আমরা পৌঁছলাম। এই দীর্ঘকালের ইতিহাসে এক অংশ ভারতীয় শিল্পের শিক্ষাপ্রণালী কিভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে সেইটি ছিল এই আলোচনার সর্বপ্রধান লক্ষ্য। যেভাবে ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতি চালিত করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রমুখ আচার্যেরা, সেই পথ যথাযথ অনুসরণ করার সম্ভাবনা আছে কি না অনুসন্ধান করা যেতে পারে। অবনীন্দ্রনাথ বা নন্দলালের শিক্ষানীতি যে আধুনিক শিল্প-শিক্ষার সম্পূর্ণ প্রতিকূল নয় সে কথা বরোদা শিল্পকেন্দ্রের আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে।

পূর্বসূরীরা যেমনভাবে ভারতীয় শিল্পের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন তারই সাহায্যে আমাদের দেশীয় শিল্পশিক্ষা পদ্ধতি আকার নিয়েছে।

ভারতীয় শিল্পের ভাবগত তাৎপর্য যতটা লক্ষ্য করবার চেষ্টা হয়েছে, তুলনায় শিল্পের আঙ্গিকগত বিচার বিশ্লেষণ যথেষ্ট হয় নি। শিক্ষার্থীর পক্ষে আজ প্রয়োজন ভারতীয় শিল্পের নির্মাণরীতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান। দৃশ্যজাত বিমূর্ত উপাদানের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিষয়ে ইউরোপ আমেরিকার শিল্পীরা পূর্বের চেয়ে সচেতন। শিল্পরূপের মাধ্যমে অলৌকিক উপলব্ধিকে আহ্বান করাই (evoke) বিশেষ করে শিল্পীরা অনুভব করার চেষ্টা করেছেন। নূতন উপলব্ধির পথে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। তবে চূড়ান্ত মীমাংসায় পৌঁছনো গেছে এ কথা কেউ বলেছেন বলে জানি না। আধুনিক শিল্পের শ্রেষ্ঠ অবদানের সঙ্গে ভারতীয় শিল্পের সম্বন্ধ কতটা ঘনিষ্ঠ তা উপলব্ধি করতে হলে প্রয়োজন ভারতীয় পরম্পরাকে আধুনিক যুগের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার। অপর দিকে পাশ্চাত্য শিল্পীদের আধুনিকতম উপলব্ধি ভারতের শিল্পসাধনার সঙ্গে তুলনা করা ও ভারতীয় সংস্কৃতির মাধ্যমে নূতনভাবে আবিষ্কার।

অতীত ও বর্তমান নিয়ে গড়ে ওঠে ভবিষ্যৎ। একান্তভাবে বর্তমানকে

স্বীকার করলে শিল্পশিক্ষার গতি রুদ্ধ হবার সম্ভাবনা। অপর দিকে বর্তমান তথা কালধর্মকে অস্বীকার করে অতীতের উপযুক্ত প্রয়োগ সম্ভব নয়। ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হওয়ার শক্তি হ্রাস পাবে। কালধর্ম সকল সময়েই অতি শক্তিশালী এই কারণে আধুনিকতা নানা ভঙ্গিতে দেখা দিয়েছে এবং লুপ্ত হয়েছে। আজকের মানুষ শক্তির উপাসক এই শক্তির প্রতীক বিজ্ঞান এবং তার সঙ্গী যন্ত্র। যন্ত্রশক্তি ও সমাজব্যবস্থা প্রায় একইভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে চলেছে। শিক্ষা দীক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যন্ত্রশক্তিকে চালু রাখার জন্যে আধুনিক শিল্পী বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন যন্ত্রবৎ চালিত সমাজের বিরুদ্ধে। কিন্তু যন্ত্রের অবদান বিজ্ঞানীর সাধনা তাঁরা স্বীকার করলেন এবং কালোপ-যোগী শিল্পরূপ গড়ে তুলতে চেষ্টা করলেন। শিল্পীরা ধর্ম ও সমাজের বন্ধন থেকে নিজেদের মুক্ত করার চেষ্টা করলেন। এই স্বাধীনতার আহ্বানে দেখা দিল নূতন শিক্ষার আদর্শ যার সূচনা আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয় আশ্রিত শিল্প-শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে।

অবনীন্দ্রনাথ আধুনিক শিল্পীর প্রতিনিধিরূপে শিল্পীর স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন কিন্তু সেই স্বাধীনতা শিল্পীরা রক্ষা করতে পারেন নি। সমাজের রুচি মেজাজ এবং জীবনযাত্রার সমস্যা সমাধানের জন্য সেই স্বাধীনতা অনেক পরিমাণে খর্ব করতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়ে নন্দলাল যে শিল্পশিক্ষার বিধিব্যবস্থা করেছিলেন সেক্ষেত্রেও শিল্পীর স্বাধীনতাই ছিল সর্বপ্রধান লক্ষ্য। ক্রমে সমাজের প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন হলেন নন্দলাল এবং শিল্পশিক্ষাকে সমাজের উপযোগী করে গড়ে তুলবার চেষ্টা করেছিলেন। আধুনিকতম শিল্প-শিক্ষা আদর্শেরও পরিবর্তন ঘটবে। ডিলার, ক্রিটিক, পৃষ্ঠপোষক ইত্যাদির সংঘবদ্ধ প্রভাব মার্কিন দেশের শিল্পীদের অনেক পরিমাণে বিভ্রান্ত করেছে। আধুনিকতার উপসর্গরূপে ডিলার ক্রিটিকদের আবির্ভাব এ দেশেও দেখা দিয়েছে। প্রত্যক্ষভাবে এই নূতন পৃষ্ঠপোষকদের সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার যোগ না থাকলেও শিক্ষার পরিণাম বহু পরিমাণে ডিলার ও ক্রিটিকদের উপর নির্ভর করছে। শিল্প ও শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্রে একটি সংস্কার ভাঙে ও ধীরে ধীরে আর-একটি

সংস্কার গড়ে ওঠে। ভাঙাগড়ার মুহূর্তে দেখা দেয় স্বাধীন শিল্পচিন্তা ও নূতন আদর্শ।

ব্যক্তিগত প্রতিভার অবদান শিল্পশিক্ষার ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। ক্রমে স্থায়িত্বের জন্য শিল্পশিক্ষার বিধিব্যবস্থার আইনকানুন তৈরি হয়। এ ক্ষেত্রে সাময়িক পরিবেশ যথেষ্ট শক্তিশালী। তবে একান্তভাবে সাময়িক পরিবেশ শিল্পচেতনার জন্মদাতা নয়। ব্যক্তিগত প্রতিভার মধ্যস্থতা ছাড়া নূতন পথ মুক্ত হয় না— এ কথার সমর্থন আধুনিক শিল্পের ইতিহাসে পাওয়া যাবে।

৭

উপসংহার

শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্রে যে কয়টি আদর্শ সম্বন্ধে এ পর্যন্ত আমরা আলোচনা করেছি সেই আদর্শের দ্বারাই ভারতের আঞ্চলিক শিল্পকেন্দ্রের শিক্ষা চলেছে। প্রায় সকল শিক্ষাক্ষেত্রেই প্রাক্তন ছাত্ররাই শিক্ষকতার কাজ করে থাকে। অধ্যক্ষ অপেক্ষা বিভাগীয় শিক্ষকদের প্রভাবই শিক্ষাকেন্দ্রগুলির মর্যাদা রক্ষা করে আসছে। প্রতিভাবান অভিজ্ঞ শিক্ষকের প্রভাবে এক সময় শিল্পকেন্দ্রগুলির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়।

ই. বি. হ্যাভেলের আন্দোলন ও অবনীন্দ্রনাথের প্রভাবে সরকারি আর্ট-স্কুলগুলিতে ভারতীয় শিল্পচর্চার ব্যবস্থা শুরু হয় ১৯০৫ থেকে ১৯১৬ সালের মধ্যে। বর্তমানে ভারতীয় শিল্পপদ্ধতি অনুশীলনের আগ্রহ অধিকাংশ আর্টস্কুলেই কমে এসেছে। ক্রমে নন্দলালের প্রভাবে ভারতীয় পদ্ধতিতে শিল্পশিক্ষার নূতন অধ্যায় দেখা দেয় এবং অসহযোগ আন্দোলনের মুহূর্ত থেকে নন্দলাল-প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতি ভারতের নানাস্থানে বিস্তৃত হয়। ক্রমে বিশ্ব-বিদ্যালয় অন্তর্ভুক্ত ডিগ্রি কোর্স ও কেন্দ্রীয় সরকার পরিকল্পিত সিলেবাস ভারতের নানা স্থানে গ্রহণ করার চেষ্টা চলেছে। কাজেই শিল্পশিক্ষার যে চারটি আদর্শ সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করেছি তারই সাহায্যে ভারতের শিল্পশিক্ষার বিধিব্যবস্থা অনুমান করতে অসুবিধে হবে না। পরিচালনা, পরীক্ষা বা পাঠ্যক্রমের মধ্যে ইতরবিশেষ থাকলেও উল্লিখিত চারটি ছাড়া সম্পূর্ণ নূতন শিক্ষা পরিকল্পনা আমরা লক্ষ্য করি না।

ইতিমধ্যে স্কুলের শিল্পশিক্ষা-ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। শিশুকাল থেকে মৌলিক রচনা, হাতের কাজ, প্রদর্শনী ও মিউজিয়ম দেখার ব্যবস্থা আধুনিক স্কুলগুলিতে গৃহীত হয়েছে। এই সঙ্গে গান্ধীজি-প্রবর্তিত বুনিয়াদি শিক্ষার উল্লেখ করা যেতে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমে বুনিয়াদি শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত

শিল্পবিভাগগুলি আজ অনেক পরিমাণে নিস্তেজ। বি. টি. ট্রেনিং কেন্দ্রগুলিতে শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা পূর্বের অপেক্ষা অনেক পরিমাণে উন্নত।

প্রত্যক্ষভাবে এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত না হলেও কারুকলার ক্ষেত্রে যে-সব পরিকল্পনা সরকার উপস্থিত করেছেন সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা দরকার। এ দেশের কারুশিল্পের উন্নতি ও একে যন্ত্রশক্তির প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা করার জন্য অনেকগুলি পরিকল্পনা হয়েছে। এক সময় ইংরাজ বণিকরা ভারতীয় কারিগরদের মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী ও ডিজাইনের প্রবর্তন করার চেষ্টা করেন। অজন্তা, সাঁচী ইত্যাদির নক্‌শা মৃৎপাত্রে প্রবর্তিত করার চেষ্টা ইংরাজ বণিকরাই প্রথম করেছিলেন। এ বিষয়ে ই. বি. হ্যাভেলের মনোভাব যথাস্থানে আমরা উল্লেখ করেছি। অবনীন্দ্রনাথ এই সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষ নজর দেন নি। নন্দলাল কারুশিল্পকে শিল্পশিক্ষার প্রধান অবলম্বন করে দেখেছিলেন। কারিগরদের সঙ্গে একাসনে বসে কাজ করার শিক্ষা নন্দলালের কীর্তি। ইতিমধ্যে নূতন উপকরণ ও নির্মাণপ্রণালী প্রবর্তিত হওয়ার কারণে কারুশিল্পের ক্ষেত্রে যে-সব সমস্যা দেখা দিয়েছিল সেগুলিকে আয়ত্ত করার চেষ্টা দেখা দিয়েছে, নূতন শিল্পশিক্ষাকেন্দ্রে ও সরকার পরিকল্পিত কুটিরশিল্প-বিভাগে। কিভাবে আধুনিক প্রণালীতে কুটিরশিল্পের সংস্কার করা সম্ভব সেইটি আজ আমাদের সামনে বড়ো সমস্যা।

মৃৎশিল্প, তাঁত, ছাপা কাপড়, ঢালাইয়ের কাজ ইত্যাদির সঙ্গে বাতিক চামড়ার কাজ ইত্যাদি নূতন কারুকর্মগুলি প্রবর্তিত হয়েছে। একসময় ইংরাজ বণিকরা দেশীয় কারুশিল্প রপ্তানি করতেন যেভাবে সেইভাবেই আজকের কুটিরশিল্প বিভাগ বিদেশে চালান দেবার জন্য নানা ব্যবস্থা করেছেন। কুটিরশিল্পের অবদান যে পর্যন্ত না দেশের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত করা যায় সে পর্যন্ত এই শ্রেণীর শিল্পের বিকাশ বিবর্তন সহজসাধ্য হবে না। সম্ভবত আধুনিক শিল্পকেন্দ্রগুলির দায়িত্ব এ দিক দিয়ে কুটিরশিল্প বিভাগের চেয়ে অধিক। কারণ শিল্পবোধ ও কর্মপ্রণালী উভয়ের সংযোগে কারুকলার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে থাকে।

ইতিমধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি যে আধুনিকভাবে শিক্ষিত অল্প কয়েকজন

শিল্পীর প্রভাবে ভারতীয় কুটিরশিল্পের নূতন দিক-পরিবর্তন ঘটেছে। আধুনিকতম শিল্পশিক্ষার লক্ষ্য হবে এই দুই দিকের সমন্বয়। আধুনিক শিল্পের ভাষা, ব্যাকরণ, করণ-কৌশলের বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য আধুনিক শিল্পশিক্ষাকেন্দ্র-গুলিতে আয়ত্ত করার ব্যবস্থা হয়েছে। যতই জটিল হোক-না কেন এ বিষয়গুলি অভ্যাসের পথে আয়ত্ত করা সম্ভব।

অপর দিকে পুস্তক-আশ্রিত শিক্ষা ও দেশের প্রাচীন কীর্তির সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়ের পথে শিল্পীদের বিচারবুদ্ধি ও অনুসন্ধিৎসা বাড়ছে এবং আরো বাড়বে। নিমন্ত্রিত শিল্পশিক্ষকদের প্রভাবে শিক্ষাব্যবস্থার সক্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে এবং পরীক্ষার সাহায্যে ছাত্রদের মানসিক ও করণ-কৌশল সম্বন্ধীয় দক্ষতা সম্বন্ধে মান-নির্ণয় সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন করা যাবে। এর পরেও একটি সমস্যা সমাধান কিভাবে হবে সে বিষয়ে অনুসন্ধান প্রয়োজন। 'শিখিয়ে পড়িয়ে শিল্পী তৈরি হয় না'— অবনীন্দ্রনাথের এই উক্তির সমর্থন সকল শিক্ষাব্রতীর কাছ থেকেই আমরা শুনছি। তৎসত্ত্বেও অভ্যাসগত শিক্ষার প্রয়োজন আছে। শিক্ষার সাহায্যে শিল্পী তৈরি হয় না জেনেও শিক্ষা দিতে হবে। তবে অবশ্যই জেনে নেওয়া দরকার যে এই পদ্ধতিতে শিক্ষার সীমা ও সম্ভাবনা কতটুকু। লক্ষ্য করা গেছে, সে সৃষ্টিরত শিল্পী এই সমস্যা সমাধান করতে অনেক পরিমাণে সক্ষম। কারণ সৃষ্টিরত শিল্পীর পক্ষে শিল্পীমনের সন্ধান পাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের মধ্যে যখন মনের যোগ স্থাপিত হয় তখনই শিল্পশিক্ষার বিষয়গুলি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। নচেৎ অতি উন্নত মার্জিত শিক্ষাপ্রণালীও জীর্ণ সংস্কারে পরিণত হয় অল্পকালের মধ্যে।

শিল্পশিক্ষা-প্রণালী চিরকাল একই রকম থাকে না। কারণ শিল্পীর জীবন বিবর্তনের পথে এগিয়ে চলে। যে শিল্পীর মনের গতি রুদ্ধ হয়েছে তার পক্ষে রীতি পদ্ধতি প্রণালী কোনো একটিকে অবলম্বন করা ছাড়া উপায় থাকে না। যে শিল্পকেন্দ্রে শিক্ষকদের মধ্যে শিল্পসৃষ্টির আবেগ হ্রাস পেয়েছে, সে ক্ষেত্রে শিক্ষা-রীতি পদ্ধতি-আশ্রিত। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র উপায় সজীব শিল্পীমনের সান্নিধ্য। তবে অনুরূপ শিল্পীর সাক্ষাৎ সকল সময় পাওয়া

যায় না। তৎসত্ত্বেও বলতে হয় শিক্ষকের অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষাদানের পদ্ধতি উভয়ের সংযোগে শিক্ষাকেন্দ্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।

ব্যক্তি ও সমাজের সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। এ দুয়ের সার্থক সংযোগ পূর্বেও যেমন হয় নি আজও তেমনি অনুপস্থিত। এর প্রধান কারণ হল ব্যক্তি বলতে আমাদের সকলের ধারণা এক নয়। আমরা অধিকাংশ মানুষই ভিন্ন ভিন্ন 'আয়তন'-যুক্ত, পৃথক 'আয়তন-অনুসারী" (fluid)। সামগ্রিক মানবীয় চেতনা প্রায় সময়েই ব্যক্তির লক্ষ্যের বাইরে থেকেছে। সমাজ বা গোষ্ঠীগত জীবন দৃঢ়তর ও সংগঠিত করে তোলার পথে ব্যক্তিকে যেমন সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে সংকীর্ণ করে দেখা হয়েছে, শিল্পের ক্ষেত্রেও অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে ব্যক্তিত্বকে কোথায় প্রতিষ্ঠিত করব তেমন সুনির্দিষ্ট পাদপীঠের দৃষ্টান্ত আধুনিক সমাজে আছে কি না বলা কঠিন।

সাম্প্রতিক শিল্পের বহু অভিনবত্বকে ব্যক্তি-স্বাধীনতার সার্থক প্রকাশ বলার চেয়ে ব্যক্তিত্বের অস্থির-চাঞ্চল্য (unstability) থেকেই উদ্ভূত বলা বোধ হয় বেশি সমীচীন। শিল্পে স্থৈর্য (stability) ও কেন্দ্রগত ভারসাম্যের (equilibrium) অনুসন্ধানের ইতিহাস আধুনিক কালের শিল্পের মধ্যেই পাওয়া যাবে। কিন্তু সেই অনুসন্ধান পরিচালনের আগ্রহ ও উপযুক্ত শিক্ষা (training) বিশেষ করে এ দেশের শিল্প-শিক্ষাকেন্দ্রে এখনো আত্মপ্রকাশ করে নি। কাজেই ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা সর্বৈব স্বীকার করলেও সেটিকে প্রতিষ্ঠিত করার পথে বাধা আজও দূর হয় নি। সেটি দূর করে ব্যক্তিসমাজের সার্থক সম্পর্ক চিহ্নিত করাই হল ভবিষ্যৎ শিল্প-শিক্ষাকেন্দ্রের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

আর একটু বিস্তৃত করে বলা যাক। যে ইতিহাস এ পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে সেই ইতিহাসের মূলে ছিল কতকগুলি শিক্ষার নির্দিষ্ট আদর্শ। আদর্শ শিল্পরূপ সম্বন্ধে শিক্ষকদের মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। এই কারণে

শিক্ষাদান কালে শিক্ষকদের মনে কোনো দ্বিধা জাগে নি এবং ছাত্ররাও দ্বিধাহীন চিত্তে গুরুকে অনুসরণ করতে পেরেছিলেন।

আজ শিল্পের বুনিয়াদে ফাটল ধরেছে। শিল্পের জগতে আপ্তবাক্য বলে কিছু আর নেই। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার অধিকার ইউরোপ থেকে আমরা পেয়েছি। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ ধরেই ইউরোপের সঙ্গে এ দেশের শিল্পশিক্ষা ও শিল্পবোধ নূতন পথ ধরে চলেছে। নব্যকালের শিল্পবোধ এমনই ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও বুদ্ধিমার্গী যে সে ক্ষেত্রে শিক্ষাব্যবস্থার বিশেষ কোনো প্রয়োজন আছে কি না এ সন্দেহ মনে উদয় হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

আজও যে শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি তার প্রধান কারণ সামাজিক চাহিদা। শিক্ষক ও কারিগর তৈরি করাই আধুনিক শিল্পশিক্ষা-কেন্দ্রগুলির প্রধান দায়িত্ব। প্রথমে শিক্ষকদের কথাই বলা যায়। বিজ্ঞানীদের গবেষণা ও শিক্ষাব্রতীদের পর্যবেক্ষণের প্রভাবে শিল্পশিক্ষার প্রয়োজনবোধ নূতন করে দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন প্রকারের হাতের কাজ করার পথে শৈশবকালের আবেগ উদ্দীপনাগুলির বিকাশ এবং ইন্দ্রিয়গত উদ্দীপনার প্রতিক্রিয়াকে সংহত করার উদ্দেশ্যে শিল্পচর্চার প্রয়োজনবোধ দেখা দিয়েছে। এই শিক্ষার লক্ষ্য শিল্পী তৈরি করা নয়। শহুরে তথা যন্ত্রচালিতবৎ জীবনে সহজাত বৃত্তিগুলির বিকাশ ক্রমেই দুরূহ হয়ে ওঠার কারণে শিশুশিক্ষার মধ্যে দিয়ে সহজাত বৃত্তিগুলির সুস্থ বিকাশ শিশুশিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। এইসব শিশুবিদ্যালয়ে যে সমস্ত শিল্পশিক্ষক নিযুক্ত হন তাঁরা একাধারে শিল্পী ও শিক্ষাব্রতী। শিশুবিদ্যালয় থেকে শুরু করে স্কুল কলেজ পর্যন্ত শিল্পশিক্ষার দায়িত্ব যে-সব শিল্পীদের হাতে তাঁদের সকলকেই অল্পবিস্তর সাধারণ শিক্ষার রীতি-পদ্ধতি জানার প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজনের দাবিতেই আজ শিল্প-বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার প্রয়োজন হয়েছে। নব্যযুগের অবদানরূপে শিক্ষাবিদ্ শিল্পীদের উল্লেখ প্রথমেই করতে হয়।

এবার কারিগরির কথা। আধুনিক প্রয়োগবিদ্যার প্রভাবে শিল্পজগতে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটেছে। কলে তৈরি জিনিসের নক্শার জন্য যে রকমের

শিক্ষা দরকার অনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা আজও এ দেশে অপরিণত অবস্থায় রয়েছে। যাঁরা এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পেরেছেন তাঁরা সকলেই ইউরোপ আমেরিকার শিক্ষার দ্বারা প্রভাবান্বিত।

আর্টস্কুলে শিক্ষিত শিল্পীদের প্রভাব কুটিরশিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে আমরা লক্ষ্য করি। এ ক্ষেত্রেও দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। আধুনিক প্রয়োগ-বিদ্যার সাহায্যে কুটিরশিল্পের বিবর্তন ঘটেছে। এই বিদ্যার জন্য অনেক পরিমাণে আমরা অন্যদেশের মুখাপেক্ষী। কাজেই আর্টস্কুলে শিক্ষার পরেও ইউরোপের কাছ থেকে পাঠ নেবার প্রয়োজন শেষ হয়ে যায় নি।

সামাজিক প্রয়োজনের যে দুই দিকের সংক্ষেপে উল্লেখ করা গেল সে ক্ষেত্রে শিল্পীদের সামনে রয়েছে কতকগুলি নির্দিষ্ট সমস্যা। এই সমস্যাগুলি সমাধান করা শিল্পীদের কাজ। নির্দিষ্ট পথে শিক্ষা গ্রহণ ছাড়া এই-সব সমস্যা সমাধান করা কোনো শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব নয়। আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতির উপযোগিতা ও অভিনবত্ব এই দিক দিয়ে।

এ দেশের শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্রে যে ভাঙাগড়া চলেছে তার অন্তরালে যে সামাজিক দাবি কাজ করছে সে বিষয়ে পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি এবং পুনরাবৃত্তির পথে বিষয়টি আরো একটু স্পষ্ট করার চেষ্টা করা গেল।

এইবার উচ্চাঙ্গ শিল্পের কথা: আজকে যাঁরা উচ্চাঙ্গের শিল্পচর্চায় রত আছেন তাঁদের কাছ থেকে সমাজ প্রত্যক্ষভাবে কিছু দাবি করে না। ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে মার্গীয় শিল্পের ক্ষেত্রে ছাত্র শিক্ষক উভয়ের কেউই কোনো নির্দিষ্ট আদর্শ অনুসরণ করতে পারছেন না।

আঙ্গিকগত কতকগুলি সূত্র অবশ্য সকল ক্ষেত্রেই স্বীকৃত। মডেল ড্রইং, স্টিললাইফ, লাইফ্ স্টাডি প্রভৃতি পুরাতন পদ্ধতি অনুসরণ করা ছাড়া অন্যপথ আবিষ্কৃত হয় নি। এইভাবে শিল্পশিক্ষা দেয়াল-ঘেরা স্টুডিয়োর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। শহুরে জীবনের সঙ্গে শিল্পশিক্ষা আজ একসূত্রে গাঁথা। বিচার-বিশ্লেষণের সাহায্যে জ্ঞানের পথে শিল্পশিক্ষা আজ এগিয়ে চলেছে। এইভাবে দেখা দিয়েছে নূতন জীবন, নূতন শিল্প ও শিক্ষা-পদ্ধতি।

এই আবহাওয়ার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির শিল্প ও শিল্পশিক্ষায় কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। এই-সব দেশে শিল্পের সাহায্যে জনসাধারণকে রাষ্ট্রীয় মতবাদ সম্বন্ধে শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা সর্বপ্রধান। মধ্যযুগীয় ধর্মাশ্রিত শিল্পের মতোই সে দেশের শিল্প সামাজিক আদর্শের ধারক। তবে পার্থক্যও আছে যথেষ্ট। এই নূতন সমাজাশ্রিত শিল্প যে আদর্শকে কেন্দ্র করে অগ্রসর হয়েছে সেই আদর্শের সঙ্গে ধর্মাশ্রিত আদর্শের পার্থক্যের বিশদ আলোচনার প্রয়োজন নেই। উদ্দেশ্যমূলক হওয়ার কারণে বাস্তবতার পথে শিল্প চালিত হয়েছে এবং শিক্ষাও সম্পূর্ণ বস্তু-আশ্রিত। ব্যক্তিগত রুচি মেজাজ প্রকাশের পথ সে ক্ষেত্রে রুদ্ধ। অপর দিকে গণতান্ত্রিক আদর্শে প্রতিষ্ঠিত দেশগুলিতে শিল্পীর স্বাধীনতা যতদূর সম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখারই চেষ্টা চলেছে। তবে যন্ত্রযুগ যে ভাবে পরিচালিত হচ্ছে তাতে ব্যক্তির স্বাধীনতা কার্যক্ষেত্রে তেমন প্রকাশিত নয়। তা হলেও যে-কোনো ব্যক্তি নিজেকে স্বাধীন রাখতে অনেক পরিমাণে সক্ষম।

গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উভয় দেশে বৈজ্ঞানিক প্রভাব একই রকম হলেও রাষ্ট্রীয় মতবাদের দ্বারা শিল্প ও শিল্পশিক্ষা ভিন্নরূপ নিয়েছে। সমাজের সৃষ্টিশক্তিকে সক্রিয় রাখতে হলে যে ব্যক্তিস্বাধীনতা দরকার এ কথা কেউই অস্বীকার করবেন না। তবে সেই সৃষ্টিশক্তি সমাজে সক্রিয় হয়ে ওঠাও বাঞ্ছনীয়; অর্থাৎ ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সংযোগ-স্থাপনের পথ অবশ্যই মুক্ত থাকা দরকার। শিক্ষার দ্বারাই এই দুই কোটির মধ্যে সংযোগ ঘটে থাকে। আধুনিক শিল্পশিক্ষা এখনও পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে নি। তবে আশা এই যে এই ব্যক্তি-স্বাধীনতার পথে শিল্পশিক্ষা ক্রমে অধিকতর সক্রিয় হয়ে উঠবে।

আর-একটি কথা! এই মুহূর্তে বিজ্ঞান আমাদের প্রধান অবলম্বন। শিল্পকলা প্রয়োগবিদ্যার দ্বারা প্রভাবান্বিত ও পরিচালিত হয়ে চলেছে। প্রয়োগবিদ্যার সাহায্যে যে শক্তি অর্জন করা গেছে তার সহায়তায় কর্মশক্তি বেড়েছে এবং কর্মপ্রণালীর বৈচিত্র্যও বৃদ্ধি পেয়েছে যথেষ্ট। তবে শিল্প-চেতনার পূর্ণাঙ্গ বিকাশের পথে এই নূতন প্রয়োগবিদ্যা কতটা স্বয়ংসম্পূর্ণ সেটি বিচার

করে দেখারও সময় এসেছে। এ কথা আমরা মানতে বাধ্য যে শিল্প-চেতনার সার্থকতা কেবল প্রয়োগবিদ্যার দ্বারা সম্পন্ন হবে না। সেজন্য প্রয়োজন মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে নবতর চেতনা। এই লক্ষ্যে উপস্থিত হবার জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থা আজও তৈরি হয় নি। সেটিই বোধ হয় ভবিষ্যৎ সমস্ত শিক্ষাব্রতীদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

প রি শি ষ্ট

রবীন্দ্রনাথের পত্র

অবনীন্দ্রনাথকে লিখিত

নন্দলালকে শান্তিনিকেতনে নিযুক্ত করার কালে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে যে পত্রবিনিময় হয়েছিল তারই একটি চিঠি রবীন্দ্র-সদনের সৌজন্যে এখানে প্রকাশ করা হল :

নন্দলালকে যে চিঠি দিয়েছ সেইটি পড়ে বড়ো উদ্‌বিগ্ন হয়েছি। তার জন্য অনেক ব্যবস্থা ও খরচ করতে হয়েছে এবং আশাও অনেক করেছিলুম। আমার আশা নিজের জন্যে নয়— দেশের জন্যে, তোমাদের জন্যে। এই আশাতেই আমি আর্থিক অসামর্থ্য সত্ত্বেও বিচিত্রায় অকৃপণ ভাবে টাকা খরচ করেছিলুম। তোমরা দেশে যে বীজ বপন করেছ সেটাই যাতে অঙ্কুরিত এবং স্থায়ী হয়ে সমস্ত দেশের চিরন্তন জিনিস হয় এই আমার কামনা ছিল। কেননা আমি জানি যে আমাদের দেশের যা কিছু স্থায়ী ও গভীর ও মঙ্গল তা স্বদেশের স্বাধীন ইচ্ছা ও চেষ্টার দ্বারাই সম্ভব। কারণ সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি সমস্ত সৃষ্টির জিনিস স্বাধীনতাপ্রসূত, তার গৌরবই তাই। এই গৌরব যদি আমরা দেশের লোক নিজের চেষ্টায় অর্জন করি তা হলেই সেটা যথার্থ National হয়। যাই হোক এই মনে করেই আমি ক্ষতিকে ক্ষতি মনে করি নি— আজও করি নে। কলকাতায় ভালো করে শিকড় লাগল না বলেই এখানে কাজ ফেঁদেছি। সফলতার সমস্ত লক্ষণই দেখা দিয়েছে। ছাত্ররা উৎসাহিত হয়েছে, শিক্ষকেরাও—একটা atmosphere তৈরি হয়ে উঠবে। নন্দলালের নিজের রচনাও এখানে যেমন অব্যাহত অবকাশ ও আনন্দের মধ্যে অগ্রসর হচ্ছে কলকাতায় হওয়া সম্ভবপর নয়। সেইটাই আমার কাছে সবচেয়ে লাভ বলে মনে হয়। নন্দলাল এখানে সম্পূর্ণ স্বাধীন— বাহির থেকে তার উপরে কোনো দায়িত্ব চাপানো হয় নি— তা ছাড়া এখানে তার নিজের কাজের ব্যাঘাত করবার কোনো প্রকার উপসর্গ নেই। আরো একটি সুবিধা এই, এখানে সংস্কৃত ও ইংরাজি সাহিত্য-

চর্চায় নন্দলাল যোগ দেওয়ায় মনের মধ্যে সে যে একটি নিয়ত আনন্দ লাভ করছে সেটা কি তার প্রতিভার বিকাশে কাজ করবে না? তোমাদের সোসাইটি প্রধানত চিত্রপ্রদর্শনীর জন্যে— এখান থেকে তার ব্যাঘাত না হয়ে বরঞ্চ আনুকূল্যই হবে। তার পর নন্দলালের লম্বা লম্বা ছুটি আছে। প্রয়োজনমত কখনো কখনো সে ছুটি বাড়াতেও পারে। অর্থাৎ আমার বক্তব্য এই যে নন্দলাল এখানে থাকাতে তোমাদেরই কাজের সুবিধা হচ্ছে— অথচ এতে আমার আনন্দ। যদি তোমরা এর ব্যাঘাত কর তা হলে আমার যা দুঃখ এবং ক্ষতি তাকে গণ্য না করলেও এটা নিশ্চয় জেনো নন্দলালের এতে ক্ষতি হবে এবং তোমাদেরও এতে লাভ হবে না। যদি সাংসারিক উন্নতির টানে নন্দলালের এই সুযোগ গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় তা হলে কোনো কথাই নেই— কিন্তু তার গুরু হয়ে তাকে এ ক্ষেত্রে ডেকো না— কেননা তোমার ইচ্ছা তাকে বিচলিত করবে— অর্থের প্রয়োজন না থাকলেও করবে। নন্দলালের 'পরে আমার কোনো জোর নেই— কিন্তু ওর 'পরে আমার অনেক আশা আছে নিশ্চয় জেনো, সে আমার কাজের দিক থেকে নয়, দেশের দিক থেকে। গভর্নমেণ্টের সঙ্গে আমি অর্থের প্রতিযোগিতা করতে পারব না কিন্তু অন্য সকল বিষয়েই মঙ্গল কামনা এবং আমাদের সম্মিলিত তপস্যার দ্বারা আমরা ওর সাহায্য করতে পারব। টাকার দ্বারা তা কখনোই হবে না। এখানে আমরা স্বার্থচিন্তা ত্যাগ করে ঈশ্বরের নাম করে যে সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছি টাকার চেয়ে তার কী বড়ো inspiration নেই— আর সেই inspirationই কি সমস্ত সৃষ্টি-কার্যের সবচেয়ে বড়ো প্রেরণা নয়? আমার কথাটাকে তোমরা বড়ো করে এবং মনকে নিরাসক্ত করে চিন্তা কোরো। তবু যদি তোমাদের অন্যরূপ ইচ্ছা হয় তবে তাই আমি ধৈর্যের সঙ্গে গ্রহণ করব ও এ পর্যন্ত যেমন একলাই আমার সব কাজ করেছি এই চেষ্টাতেও আবার সেইরকম একলাই চলতে থাকব। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।

২

নন্দলালের উক্তি

মেনা দেশাই-এর ডায়ারি। ১৯৩৯-৪১

তাঁর ছাত্রী মেনা দেশাই নন্দলালের ছোটখাট কথাবার্তা লিখে রেখেছেন। এইসব লেখা থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা গেল ডায়ারি গুজরাটি ভাষায় লেখা। কাজেই আক্ষরিক অনুবাদ না করে মূলসূত্রগুলি বাংলায় উপস্থিত করা হল—

'ছোটছেলের ছবিতে ভাবনা থাকে না। যা মনে আসে তাই আঁকে। এইরকম ভাবে কম্পোজিশন ভাববার চেষ্টা করবে। বুড়ো বয়সে এই রকম সহজ ভাব অনেক সময় ফিরে আসে।'···

'আগে মনে ছবি তৈরি হয়, তার পর সেটা কাগজে আঁকা হয়। কাগজের সামনে বসে কী আঁকব ভেবে ভেবে ভালো কম্পোজিশন হয় না।'

'আগে নেচার স্টাডি তার পরে ডেকোরেটিভ কাজ। নেচার স্টাডি না করলে যথার্থ ডিজাইন করা যায় না।' (বিষয়টি নক্‌শা এঁকে নন্দলাল দেখিয়েছেন)···

'মাছ জলের জীব। মাছের গতি ও গড়নের বৈশিষ্ট্য মনে রাখবে। মাছের গড়নকে কলকায় পরিণত করলেই তাকে ভাল নক্‌শা বলে না'।··

'প্রথম থেকে পৌরাণিক বিষয় নিয়ে ছবি আঁকা উচিত নয়। তাতে আর্টিস্টের ক্ষতি হয়।'

দূরের জিনিস নীল দেখায় কেন এর জবাবে নন্দলাল বলেছেন, 'আবহাওয়ার প্রভাবে দূরের জিনিস নীল দেখায়। জলের মধ্যে জিনিস ঐ রকম নীল বোধ হয়।'···

'জিনিস যত দূরে যাবে তত তার ব্লক স্পষ্ট হবে। কাছে থেকে জিনিসের ডিটেল বেশি চোখে পড়ে, তাই ব্লক চোখে ধরা পড়ে না। এইজন্য জিনিস কাছে থেকেও দেখবে, দূরে থেকেও দেখবে।'···

'নেচার স্টাডি করবার কী প্রয়োজন— এই প্রশ্নের জবাবে আচার্য বলেন ফুল স্টাডি থেকে রং দেখা যায়।...

'ডিজাইন নেচারের আইন মেনে চলবে। যা হোক কিছু মন-গড়া হলেই সেটা ডিজাইন হয় না। প্রকৃতির নিয়মের কথা ভেবে ডিজাইন করতে হয়।'...

ফিনিস মানে কি? জবাব— 'ছবির প্রধান প্রধান অংশের স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়ে তোলা। ফিনিসের লক্ষ্য আগে প্রধান বস্তু, পরে গৌণ বস্তু ফিনিস করতে হয়।'

৩

বউহাসের আদর্শ

The Bauhaus

"The Bauhaus, founded by Walter Gropius in 1919, in Germany, attempted to meet this shortcoming education without its bearing in environment and in society, not placing "subject" at the head of its curriculum, but man, in his natural readiness to grasp the whole of life. ...the pattern of a community of students who learn "not for school, but for life." Such a society implies practice in actual living. Its individual members have to learn to master not only themselves and their own powers, but also the living and working conditions of the environment.

"The first year in the Bauhaus is of decisive importance especially for those young people, who in consequence of the usual education, have brought with them a sterile hoard of text-book information.

"Their training this first year is directed toward sensory experiences, enrichment of emotional values, and the development of thought. The emphasis is laid not so much on the differences between the individuals but more on the integration of the common biological features and on the objective scientific and technical facts. This allows a training based on free vocational selection within the Bauhaus shops. During this period the goal still remains man as a whole.

Objectives and Methods of Bauhaus education

"It is historically interesting that everywhere in the world outstanding industrial products emerged, but only as unintentional and necessary creations in fields where not tradition but functions alone determined the form to be given.... But basically it was not industry, nor the technical experts, but the artist

pioneers who dared to proclaim the conception of "functional rightness" even as applied to machine products. ("Form follows function" Sullivan and Adler stated.) This created the atmosphere, this gave the real impetus to the new understanding of form on the basis of the changed technical, economic and social conditions.

"Gropius declared that the designer has to think and act in the terms of his time. He wished to abolish the supremacy of intellectual work over handwork. He pointed out the great educational value of craftmanship. "The machine cannot be used as a short cut to escape the necessity for organic experience" (Lewis Mumford). In the Bauhaus, on the technically simple level of handwork, still possible to grasp as a whole, the student can watch the product grow from beginning to end. His glance is directed to the organic whole.... In handicraft the individual is always responsible for the whole, as well as for its function. Thus the manual training in the Bauhaus is to be taken in part as an educational factor and in part as the necessary tool for the industrial model, not as an aim in itself. This is the reason why the handicrafts are combined in the Bauhaus also with the basic machines of the respective industries....

"By uniting an artistic, scientific and a real workshop training — with tools and basic machines, by keeping in constant touch with advancing art and technique, with the invention of new materials, and new constructions, the teachers and students of the Bauhaus were able to turn out designs which had a decisive influence not alone on industrial production, but also in reshaping of our daily life. The invention of tubular furniture, modern lighting fixtures, practical household appliances, new types of hardware, electrical contrivances, textiles, new typography, modern photography, etc., are the functional results of this work."[১]

১ *The New Vision*, L. Moholy-Nagy, Faber and Faber, London, p. 17-20.

৪

বরোদার ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্ট্‌স্‌-এর অধ্যক্ষ কে. জি. সুব্রহ্মণ্যমের লেখা পত্রের অংশ

"There is no doubt that the Faculty of Fine Arts, Baroda drew on the experience of Kala-Bhavana. It was meant to foster a similar liberal multi-disciplinary atmosphere as was once there in the Kala-Bhavana-Sangit-Bhavana complex. This Faculty has under its aegis, apart from the Fine Arts College, the College of Modern Music, Dance & Drama and the Department of Museology. In the early years it had also the Department of Architecture within it. It was thought they will all work together and initiate useful trends,"[১]

[১] Letter addressed to the author dated 30. 10. 68

কলাভবনে অনেক বিষয় অধ্যাপক ও ছাত্ররা শিখেছিলেন পুস্তকের সাহায্যে। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির উল্লেখ প্রয়োজন :

A TREATISE ON PAINTING written by
CENNINO CENNINI in the year 1437

And first Published in Italian in 1821, with an Introduction and Notes by Signor Tambroni containing Practical Directions for Painting in Fresco, Secco, Oil and Distemper, with the art of Gilding and Illuminating Manuscripts adopted by the

OLD ITALIAN MASTERS

"Of all the modes of painting used by the masters of these times, as well as by those who succeeded them, Cennino has composed the most complete treatise that has ever been written."—Tambroni

Translated by MRS. MERRIHELD with an Introductory Preface, copious notes and illustrations in outline from celebrated Pictures.
EDWARD LUMLEY, 56, CHANCERY LANE, LONDON.

M. DCCC. XLIV.

MODELLING
A Guide for Teachers and Students. Vol. I
by Ed. LANTERI,
Professor of Sculpture at the Royal College of Art, South Kensington.
CHAPMAN & HALL LTD
11 HENRIETTA STREET, London W. C. 2.—1922.

I MANOSCRITTI[১]
DI
LEONARDO DA VINCI
DELLA REALE BIBLIOTECA DI WINDSOR

১ রবীন্দ্রনাথের আনা মুসোলিনী-সংগ্রহের অন্যতম মূল্যবান বই।

DELL' ANATOMIA,
FOGLI A
PUBBLICATI DA TEODORO SABACHNIFOFF
TRANSCRITTI E ANNOTATI
DA
GIOVANNI PIUMATI
CON TRADUZIONE IN LINGUA FRANCESE
PRECEDUTI DA UNO STUDIO DI MATHIAS-DUVAL
PARIGI
EDOARDO ROUVEYRE EDITORE
MDCCC XCVIII.

প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের পথে কিভাবে ডিজাইন করতে হয় এ বিষয়ে নন্দলালের একটি বিশেষ পদ্ধতি ছিল। এই নক্শাগুলি থেকে তার কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে। এই প্রসঙ্গে বীরেশ্বর সেনকে লেখা চিঠির অংশ উদ্‌ধৃত করা গেল :

Decorative Designs (মণ্ডন শিল্প) সম্বন্ধে আমি যেটুকু ভেবে পেয়েছি তা পরে লিপিবদ্ধ করচি। কাজে লাগতে পারে। এগুলোকে rigid বা অখণ্ডনীয় নিয়ম বলে গণ্য করতে গেলে ভুল হবে।...

আমি মোটামুটি যে কটা গড়ন পেয়েছি তা দেখাচ্ছি। যেমন ডিম, আমের কষি, পদ্মবীজ, লাউ, কলি, যব, পান, কলকা, শঙ্খ, চাঁদ, পদ্মচাকী। (অ, আ, ই, ঈ)।

(খ) প্রকৃতির রূপভেদের পরেই চোখে পড়ে প্রকৃতির গতিশক্তি। সে শক্তি কখনও দেখি রশ্মি দিয়ে চারিদিকে বার হচ্ছে, কখনও দেখি গাছ হয়ে উঠছে, ফুল হয়ে ফুটছে, মেঘের আবর্ত হয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে চলেছে, উৎসের ধারায় উৎসারিত হচ্ছে, স্ফুলিঙ্গের কুটিল রেখায় কাঁপছে, তরঙ্গের দোলায় দুলছে। সে শক্তিও নানা রকমের, আর তার বিকাশও বিচিত্র।

১ 'অয়ন' পত্রিকায় প্রথম এই নক্শাগুলি প্রকাশিত হয়। 'শিল্পকথা' ও 'শিল্পচর্চা'র এ বিষয়ে নন্দলাল যে-সব আলোচনা করেছেন সেগুলিও জিজ্ঞাসু পাঠক দেখে নিতে পারেন।

শিক্ষা ও শিল্প' শীর্ষক আলোচনাটি ইতিপূর্বে বিশ্বভারতী পত্রিকার শ্রাবণ-আশ্বিন ৮৭৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

এই পুস্তক রচনাকালে কয়েকটি বিশিষ্ট পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থের সাহায্য য়েছি। সেগুলির উল্লেখ করা সমীচীন বোধ করছি এজন্যই যে ভবিষ্যতে ই বিষয় নিয়ে যাঁরা অনুশীলন করবেন তাঁদের পক্ষেও এই পুস্তকগুলি অপরিহার্য হবে।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ
ভারতশিল্পে মূর্তি
আপন কথা
জোড়াসাঁকোর ধারে

অসিতকুমার হালদার ॥ রবিতীর্থ

পেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ॥ হিন্দুজাতি ও শিল্প

নন্দলাল বসু ॥ শিল্পকথা
শিল্পচর্চা

জেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সংবাদপত্রে সেকালের কথা

শান্তিনিকেতন পত্রিকা ॥ সম্পাদক বিধুশেখর শাস্ত্রী

শ্রী অন্নদাচরণ বাগচী ॥ জুবিলী আর্টস্কুল কর্তৃক প্রকাশিত

রকারী আর্ট কলেজ পত্রিকা ॥ কলিকাতা থেকে প্রকাশিত জুবিলী সংখ্যা

Abanindranath Tagore ॥ Golden Jubilee Number, Pulinbihari Sen ed., Indian Society of Oriental Art, Calcutta.

Journal of Indian Art and Industry ॥ Published by W. Griggs & Sons Ltd., London[১] S. E.

Visva-Bharati Quarterly—Abanindra Number.

---

১ ইংরাজ-পরবর্তী শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে তেমন কোনো গ্রন্থ নেই। কিন্তু এ দেশে আর্টস্কুলের রূপাত নিয়ে নানা প্রামাণিক তথ্যের আকর হল উল্লিখিত Journalটি।